মহিসন্তোষ

সুলতানী আমলে হারিয়ে যাওয়া একটি নগরী

মোঃ আবদুল করিম



মহিসন্তোষ : সুলতানী আমলে হারিয়ে যাওয়া একটি নগরী

মোঃ আব্দুল করিম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
গবেষণা বিভাগ

মহিসন্তোষ : সুলতানী আমলে হারিয়ে যাওয়া একটি নগরী
মোঃ আবদুল করিম
ইফাবা গবেষণা ঃ ১২১
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২৪৭৫
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৯৫৪.৯২
ISBN : 984-06-1246-8

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০০৮
আশ্বিন ১৪১৫
শাওয়াল ১৪২৯

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
পরিচালক, গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

প্রুফ সংশোধন
মোঃ আইয়ুব আলী

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য ঃ ৪০.০০ (চল্লিশ) টাকা

MAHISHANTAS : SULTANI AMALE HAREA JAWA ACTI NAGARI written by Md. Abdul Karim and Published by A. M. M. Serajul Islam, Director Research Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka_1207, Phone : 9133391 October 2008

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
website : islamicfoundation.org.bd.com

Price : TK. 40.00 Us Doller : 1.00

উৎসর্গ

মহিসন্তোষ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা

মাওলানা তাকী উদ্দিন আল-আরাবীর স্মরণে

সূচি

প্রকাশকের কথা

ইতিহাস মানব জীবনের অতীত জীবনালেখ্য। জাতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ভিত্তিভূমি। ইতিহাসের মাধ্যমে মানুষ তার আত্মপরিচয়মূলক অতীতকে খুঁজে পায়। ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করে জাতির গৌরবগাঁথা এবং কালপরিক্রমায় হারিয়ে যাওয়া সমৃদ্ধ ইতিহাসকে অবলম্বন করে একটি জাতি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রাসাদ নির্মাণ করে।

বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস রচনার গোড়াপত্তন কবে থেকে শুরু হয় তা গবেষণার বিষয়। দেশ, স্থান ও কালের সূত্র ধরে অতীত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস অনুসন্ধান আমাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। সামগ্রিক ভূখণ্ডগত ইতিহাসের স্রোতধারায় উঠে আসে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর অতীত জীবনবোধ, ধর্ম-সংস্কৃতি, যুদ্ধ-সংগ্রাম, কৃষিকর্ম, ও জীবনাচরণসহ সামগ্রিক জীবনালেখ্য। তবে ক্ষুদ্র পরিসরে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ধারাও থেমে নেই।

এ দেশে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা শুরু হয় ইংরেজ শাসনামলে। ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে জেলা ভিত্তিক ইতিহাস রচনা শুরু হয়। আলোচিত সে সব স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ভিত্তিভূমিতে বাংলাদেশের কয়েকজন ইতিহাস অনুরাগী আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম কাজী মোহাম্মদ মিছের, খান সাহেব মোহাম্মদ আফজাল ও ড. এ. বি. এম. হোসেন।

মহিসন্তোষ আলোচিত আঞ্চলিক ইতিহাসের এক সোনালী অধ্যায়। সুলতানী আমলে বাংলামুলকে যে কয়টি সমৃদ্ধ নগর সভ্যতার গোড়াপত্তন হয় তন্মধ্যে মহিসন্তোষ অন্যতম। নওগাঁ জেলায় ধামইরহাট উপজেলাধীন চৌঘাট মৌজায় অবস্থিত এই মহিসন্তোষ নগরী।

অঞ্চল ভিত্তিক ইতিহাস রচনায় মহিসন্তোষকে নিয়ে যারা ইতিহাস রচনা করেছেন তারা সবাই সফল একথা বলা যাবে না। এ ক্ষেত্রে মোঃ আবদুল করিম অনেকখানি সফল বলা যায়। তিনি **"মহিসন্তোষ : সুলতানী আমলে হারিয়ে যাওয়া একটি নগরী"** শিরোনামে লিখিত গবেষণা পুস্তকটিতে অনেক তথ্য ও তত্ত্ববহুল ইতিহাস তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছে। এ জন্য আমরা গবেষককে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। তিনি এই ক্ষুদ্র পরিসরের পুস্তকটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। অধ্যায়গুলো হলো : ১. মহিসন্তোষের নামকরণ; অবস্থান ও পরিচিতি; ২. ইযযুদ্দীন মুহাম্মদ শীরান খালজী ও মহিসন্তোষ; ৩. মহিসন্তোষ মাদ্রাসা ও পাঠ্যসূচি; ৪. মহিসন্তোষ মসজিদ ও শিলালিপি; ৫. বারবকাবাদ টাকশাল ও মুদ্রা। এর সাথে সংযোজিত হয়েছে কিছু দুর্লভ মানচিত্র, স্মারক মুদ্রা ও প্রত্ন নিদর্শনের তালিকা।

আমরা আশা করি, ক্ষুদ্র পরিসরের হলেও গ্রন্থটি প্রকাশ করে গবেষণা বিভাগ প্রশংসিত হবে। জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্যের সমৃদ্ধশালী এ পুস্তকখানা পাঠক প্রিয়তা অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করি। সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সুধী পাঠক আমাদেরকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

গ্রন্থটি প্রকাশ পর্যায়ে যারা এর সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে নানাভাবে শ্রম দিয়েছেন আমরা তাঁদের সকলকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। গ্রন্থটি সুধীমহলে সমাদৃত হলে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম
পরিচালক
গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ভূমিকা

ইতিহাস মানব জীবনের স্রোত আলেখ্য ; সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সজীব প্রতিবেদন। ইতিহাসের মাধ্যমে মানুষ তার নিজের পরিচয় খুঁজে পায়, তার অতীতকে জানতে পারে। সুদৃঢ় অতীত জাতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ভিত্তিভূমি। অতীতের স্মৃতি জাতির প্রাণে ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে প্রেরণা যোগায়।

একদিকে প্রশাসনিক বিবর্তনের ইতিহাস ও আঞ্চলিক উন্নয়নের বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যে প্রশাসকগণ আঞ্চলিক ইতিহাস জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, অন্যদিকে নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে জানা ও নিজ নিজ এলাকার বিস্মৃত ঐতিহ্য পুনঃরুদ্ধারের প্রতিও সাধারণ মানুষের কৌতুহল রয়েছে। এসব করণে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাই জাতীয় ইতিহাস পুনর্গঠনে আঞ্চলিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। আলোচ্য 'মহিসন্তোষ' আমাদের আঞ্চলিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এদেশে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা শুরু হয় ইংরেজ শাসনামলে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইংরেজ শাসকগণ জেলা ভিত্তিক ইতিহাস রচনা শুরু করেন। এতে তারা বিভিন্ন জরিপ ও তথ্যবহুল সরকারী রিপোর্ট বা প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তাদের স্থানীয় ও আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার বেশ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সংকলিত *Annal of Rural Bengal* ও *statistical Account of Bengal* গ্রন্থ দু'টি সুধী মহলে বেশ প্রশংসিত হয়।

বিদেশী প্রশাসকদের স্থানীয় ইতিহাস চর্চার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বিংশ শতকের মাঝামাঝিতে দেশীয় কয়েকজন ইতিহাস অনুরাগী স্থানীয় ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তাঁদের অপেশাদারী অবস্থান ও সমকালীন দলিল-দস্তাবেজ ব্যবহার না করায় ঐ সব রচনা মানসম্মত হয়ে উঠে নি।

মহিসন্তোষসহ অত্র অঞ্চলের ইতিহাস রচনায় যে কয়েকজন ইতিহাস অনুরাগী এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে কাজী মোহাম্মাদ মিছের লেখেন 'রাজশাহীর ইতিহাস' দু'খন্ডে। গ্রন্থ দুটি ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। এর দ্বিতীয় খন্ডে মহিসন্তোষের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। এর পর লেখেন খান সাহেব মোহাম্মাদ আফজাল 'নওগাঁ মহকুমার ইতিহাস'। গ্রন্থটি ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়। সেখানেও মহিসন্তোষের কিঞ্চিত পরিচয় পাওয়া যায়। 'মহিসন্তোষের মুসলিম নিদর্শন'

শিরোনামে ১৩৭৬ সনে বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকায় আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ এ. বি. এম. হোসেন-এর একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। এতে মহিসন্তোষের একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা হয়। তবে পূর্ণাঙ্গ বই লেখার মত তথ্য উপরোক্ত সূত্রগুলোতে নেই বা এদিকে কোনো পেশাদারী লেখক বা গবেষক পন্ডিতও এগিয়ে আসেন নি।

বিগত শতকের ৬০ এর দশকের গোড়ার কথা। তখন আমি ফার্সিপাড়া (নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলা সদর) সফিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। একদিন খেয়াল বসে মহিসন্তোষ (স্থানীয়ভাবে মাইগঞ্জের দরগা নামে পরিচিত) দেখতে যাই। স্থানটি ধামইরহাট উপজেলা সদর থেকে ৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে চৌঘাট মৌজায় অবস্থিত। সত্যি আমার কচি মনে ঐতিহাসিক মহিসন্তোষের ধ্বংসস্তুপ, মসজিদ, মাযার, মহীপাল দীঘি, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইট-পাটকেল মিশ্রিত ভিটেমাটি দেখে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু জ্ঞানের গভীরতা না থাকায় সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই নি। তখন থেকেই আমার ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে এ সম্পর্কে জানার। পরবর্তীতে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে এর কিছু কিছু তথ্য উদ্ধার করতে সক্ষম হই। এবং এর কিছুটা পূর্ণতা লাভ করে দীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনে। ফলে বিগত ৮০ এর দশকে 'রাজশাহী বার্তায়' এ সম্পর্কে কয়েকটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করি। আরো পরে ১৯৯৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আমি 'বারবকাবাদ অঞ্চলের প্রশাসন : একটি সমীক্ষা (১২০০-১৭৫৭ খ্রিঃ)' শীর্ষক এম. ফিল অভিসন্দর্ভ রচনায় মনোনিবেশ করি তখন ঐ মহিসন্তোষই আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। বড় সুবিধা হল থিসিস করতে গিয়ে মহিসন্তোষ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য আমার হাতে এল যার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করে 'মহিসন্তোষ : সুলতানী আমলে হারিয়ে যাওয়া একটি নগরী' শীর্ষক এই সামান্য গ্রন্থটি রচনা করলাম। আকারে সামান্য হলেও এটি তথ্যবহুল এবং সমৃদ্ধ হয়েছে বলে আশা করা যায়।

বর্তমান গ্রন্থটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে এর মহিসন্তোষ নামকরণ, বর্তমান অবস্থান ও পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। এতে মহিসন্তোষের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা পূর্বক গ্রন্থটির শিরোনাম 'মহিসন্তোষ : সুলতানী আমলে হারিয়ে যাওয়া একটি নগরী' করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে মহিসন্তোষে : মুসলিম আমলে বসতি স্থাপন, নগরায়ন, পত্নসম্পদ এবং এর ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে। প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানে যেসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে তাতে একথা অনস্বীকার্য যে, এই নগরী এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অধিকারী। মহিসন্তোষের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে মিশে আছে এদেশের পালরাজ প্রথম মহীপালের (৯৮৮-১০৩৮ খ্রীঃ) রাজত্বের মহিয়ান কীর্তি। হিন্দু শাসনামলে এটি একটি প্রশাসনিক ইউনিট (জয়স্কন্ধবার) ছিল বলে ধারণা করা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠালগ্নে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ইতিহাস। এর পটভূমি বঙ্গ বিজেতা ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী থেকে শুরু হয়েছে। মুসলিম বাংলার দ্বিতীয় শাসক ইযযুদ্দীন মুহাম্মাদ শীরান খলজীর কর্মস্থল (ইকতা) মহিসন্তোষ সম্পর্কে এতে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে মহিসন্তোষে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে ও সমাজ গঠনে যে ভূমিকা রেখেছে সে সম্পর্কে একটি চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার গোড়াপত্তন হয় এই মহিসন্তোষে, যার বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে আরবের বিশিষ্ট পন্ডিত ও আধ্যাত্মিক সাধক মাওলানা তাকী উদ্দীন আল-আরাবী আলোচ্য মহিসন্তোষে এসে দ্বীনের প্রচার শুরু করেন এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন যেটি পরবর্তীতে বাংলার সুলতানদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে প্রথম শ্রেণীর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়। বাংলার সুলতানগণ মহিসন্তোষ মাদ্রাসা ও মসজিদের পরিচালনার জন্যে ২৭৫০ বিঘা লাখারাজ ভূমি দান করে এটিকে একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। মহিসন্তোষ মাদ্রাসায় পঠিত বিষয় সম্পর্কে এতে একটি আলোচনা পেশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিহারের মানের শরীফের বিখ্যাত সূফী-সাধক মখদুম শায়খ শরফ উদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরীর পিতা শায়খ ইয়াহিয়া মানেরী মহিসন্তোষ মাদ্রাসার মাওলানা তাকী উদ্দীন আল-আরাবীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে বারবকাবাদ (মহিসন্তোষ) টাঁকশাল প্রতিষ্ঠা এবং এখান থেকে জারীকৃত মুদ্রা সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হয়েছে। বাংলার দুশো বছর (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিঃ) স্বাধীন সুলতানী আমলের অন্ততঃ তিনজন সুলতান এই টাঁকশাল থেকে তাঁদের মুদ্রা মুদ্রিত করেন। অত্র অঞ্চলের জনগণের সহজ লেন-দেনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এই টাঁকশাল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল বলে ধারণা করা যায়। ফলে মহিসন্তোষ নগরী বাংলার সুলতানী আমলে একটি টাঁকশাল শহরে উন্নীত হয়।

ইংরেজ শাসনামলের শেষ পর্যন্ত বর্তমান নওগাঁ জেলাধীন ধামইরহাট উপজেলা দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল; বিধায় সমসাময়িক ঐতিহাসিগণ মহিসন্তোষকে দিনাজপুর জেলায় দেখিতে ইতিহাস রচনা করেছেন।

সমৃদ্ধ বর্তমানের মধ্যে আমরা খুঁজে পেতে চাই আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ও সম্ভাবনাময় ভবিষৎকে। এজন্যেই আমি আমার নিজস্ব এলাকার ইতিহাস রচনায় হাত

দিয়েছিলাম। কাজটি কেমন হয়েছে তা সুহৃদ পাঠকগণই বিচার-বিশ্লেষণ করবেন। এই সুকঠিন কাজে আমাকে সবসময় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন আমার সুহৃয় সহকর্মীগণ। এক্ষণে আমি তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আমি এই মহতি প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছে ঋণী।

পরিশেষে আল্লাহ্ পাকের অশেষ শুকরীয়া আদায় করে এবং তাঁর রহমত কামনা করে আমি আমার প্রারম্ভিক বক্তব্য পেশ করলাম। আল্লাহ্ হাফেজ।

মোঃ আব্দুল করিম

প্রথম অধ্যায়

মহিসন্তোষ : নামকরণ, অবস্থান ও পরিচিতি

ইতিহাস কোনো কিছু উদ্ভব ও বিকাশের ধারাবাহিক বিবরণ ; অতীতে যা ঘটেছিল তারই বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মধ্যযুগের বাংলার মুসলমানদের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস নেই। সেই সাথে তাঁদের কর্মকান্ডের ধারাবাহিক বিবরণ, যা আজও সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয় নি।

মহানবী (স)-এর ওফাতের পরে তাঁর বাণী সংগ্রহের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হয় এবং তাঁদের আর্থ-সামাজিক পরিসর বৃদ্ধির ফলে অষ্টম শতকের গোড়ায় (৭১২ খ্রিঃ) ভারতের পশ্চিমাঞ্চলেও মুসলমানদের ইতিহাস শুরু হয়। তবে আলোচ্য মহিসন্তোষ অঞ্চলে মুসলমানদের ইতিহাস শুরু হয় আরো পরে, অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দশকে।

উল্লেখ্য, ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর সফল অভিযান পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের যে অঞ্চলে প্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তার উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল বর্তমান নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলাধীন চৌঘাট মৌজাস্থ মহিসন্তোষ। বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মুসলিম রাজ্যে বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বিভক্ত 'ইকতা'র (প্রশাসনিক ইউনিট) মধ্যে *তাবকাত-ই নাসিরীতে* বর্ণিত 'মসিদা-সন্তোষ' ইকতাকে আলোচ্য মহিসন্তোষের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়।[১] উল্লেখ্য, বখতিয়ার খলজী তাঁর বিজিত অঞ্চলকে প্রশাসনিক সুবিধার্থে তিন ইকতায় বিভক্ত করেন। এগুলো হলো ঃ মসিদা-সন্তোষ, নারকোটি এবং গাংগুরি বা গাংকুরি। বখতিয়ার খলজী তাঁর তিনজন বিশ্বস্ত সহচর ও উচ্চ সামরিক পদের অধিকারীকে এই তিন ইকতার মুকতা (প্রশাসক) নিয়োগ করেন। এঁদের মধ্যে মুহম্মদ শীরান খলজীকে মসিদা-সন্তোষ (মহিসন্তোষ), আলী মর্দান খলজীকে নারকোটি (নারনকোই-নাটারী-নাটোর) এবং হুসাম উদ্দীন ইওয়াজ খলজীকে গাংগুরি বা গাংকুরির মুকতা নিয়োগ করেন।

মহিসন্তোষের অবস্থান আমাদের ইতোপূর্বেই জানা হয়েছে। নারকোটিকে বর্তমান নাটোরের সঙ্গে অভিন্ন মনে হয়[২] এবং গাংগুরি বা গাংকুরিকে বর্তমান ভারতের পশ্চিম

---

১. মীনহাজ-ই-সিরাজ, তবকাত-ই নাসিরী (আ. কা. মো. যাকারিয়া, অনূদিত ও সম্পাদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ.-৪৮; এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, **আসপেক্ট অব সোসাইটি এন্ড কালচার অব দি বরেন্দ্র**, রাজশাহী, ১৯৯৮, পৃ. ১২৬।

২. নীহার রঞ্জন রায়, **বাঙ্গালীর ইতিহাস**, আদি পর্ব, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ১৪০২ সন, পৃ. ৮৮।

বঙ্গের মালদহ জেলাধীন তান্ডার (তাড়া) সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়।[৩] সে সময় থেকেই মহিসন্তোষ একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে গুরুত্ব লাভ করে।

মহিসন্তোষ নামকরণ সম্পর্কে যে সামান্য তথ্য পাওয়া যায়, তাতে ধারণা করা যায়, *তবকাত-ই নাসিরীতে* বর্ণিত 'মসিদা-সন্তোষ' থেকে মহিসন্তোষ নামের উৎপত্তি হয়েছে। তবে মহিসন্তোষে প্রাপ্ত হিন্দু আমলের প্রত্ন সম্পদ সূত্রে কেউ কেউ স্থানটিকে সে আমলের একটি জয়স্কন্ধবার (প্রশাসনিক ইউনিট) বলে অনুমান করেন এবং এটি পালরাজ প্রথম মহীপালের নামের সঙ্গে সংযুক্ত করে মহীসন্তোষ বলেন। মহিসন্তোষে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের মিহরাবে (এটি রাজশাহী বরেন্দ্র যাদুঘরে সংরক্ষিত হয়েছে) ব্যবহৃত প্রস্তরখন্ডে বিষ্ণু, উমা, মহেশ্বর, সূর্য, লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্তির চিহ্ন দেখে অনুমান করা হয়, ঐ প্রস্তর খন্ডগুলো স্থানীয় কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির থেকে নিয়ে মিহরাবের উপযোগী করা হয়েছিল।[৪৫] ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বরেন্দ্র যাদুঘরের উদ্যোগে সেখানে প্রথম উৎখনন কার্য পরিচালিত হয়। উৎখনন কার্যের নথিপত্রে স্থানটিকে হিন্দু সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে, পালরাজ প্রথম মহীপাল কম্বোজান্ধারাজ গৌড়পতির হাত থেকে বরেন্দ্র উদ্ধার করে মহিসন্তোষে একটি নতুন নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তাই মনে হয়, এখানকার মহীপাল দীঘি (স্থানীয়ভাবে মিঠাপুকুর নামে পরিচিত) রাজা মহীপালেরই স্মৃতি বহন করে চলেছে। যা হোক, মহিসন্তোষ মুসলিম অধিকারে এসেও এর প্রশাসনিক গুরুত্ব বজায় রাখে, শুধু এর প্রশাসনিক পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে।

মহিসন্তোষ মুসলিম অধিকারে এসে সামরিক দিক দিয়ে প্রভূত গুরুত্ব লাভ করে। এখান থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য স্থানটি সামরিক ঘাটিতে পরিণত হয়। মহিসন্তোষের দুর্গ-প্রাচীর, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রস্তর খন্ড, স্থানে স্থানে পাকা রাস্তার চিহ্নাবশেষ, অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়, ইট-পাটকেল মিশ্রিত বিস্তৃত ভিটেমাটি ইত্যাদি সূত্রে অনুমান করা যায়, এটি একটি সুরক্ষিত গড় ছিল। মহিসন্তোষ থেকে একটি কামান রাজশাহী বরেন্দ্র যাদুঘরে স্থানান্তরিত হওয়ায় এই যুক্তি আরো জোরালো হয়েছে।[৬] এতদ্ব্যতীত মহিসন্তোষ নগরীর ভূমি নক্‌শা দেখেও অনুমান করা যায়, এটি মুসলিম শাসনের প্রারম্ভিক পর্যায়েই একটি সুরক্ষিত নগরে উন্নীত হয়েছিল।

বাংলার সুলতানী আমলে (১২০৫-১৫৩৮ খ্রিঃ) বিদেশাগত শিক্ষক, পীর, মাশায়েখ এবং দরবেশদের তালিকায় দেখা যায়, ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে

---

৩. যদুনাথ সরকার (সম্পাঃ), **হিস্ট্রি অব বেংগল**, ভলুম-২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৬, পৃ. ১৩, পাদটীকা -১।

৪. এ. বি. এম. হোসেন "মহিসন্তোষের মুসলিম নিদর্শন", **ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা**, পৌষ-চৈত্র, ঢাকা, ১৩৭৬ সন, পৃ. ২৭৭-২৮৯।

৫. মীর জাহান, **"মিন্ট টাউন্‌স্‌ অব মেডাইভাল বেংগল,'** পি. পি. এইচ. সি., ঢাকা, তৃতীয় বৈঠক, ১৯৫৩, পৃ. ২৩৬-২৩৭।

৬. দ্রষ্টব্যঃ এম. এ. রহিম, **বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস**, ১ম খন্ড (মোঃ আসাদুজ্জামান অনুঃ), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ২০৫।

মাওলানা তাকী উদ্দীন আল-আরাবীর প্রচেষ্টায় এখানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এই মাদ্রাসা বাংলার শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। আধ্যাত্মিক সাধক ও সুপন্ডিত তাকী উদ্দীন আল-আরবী আজীবন এই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি মহিসন্তোষেই চির নিদ্রায় শায়িত আছেন। বিহারের মানের শরীফের বিশিষ্ট আলেম ও প্রখ্যাত সূফী মখদুম-উল-মূলক শায়খ শরফ উদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরীর পিতা ইয়াহিয়া মানেরী মাওলানা তাকী উদ্দীন আল-আরাবীর নিকটে মহিসন্তোষ মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করেন। এখানে তিনি ইল্‌মে দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় এবং মারিফাত তত্ত্বে পারদর্শিকতা অর্জন করেন। উভয় বিষয়ে মাওলানা তাকী উদ্দীন আল-আরাবী তাঁর উস্তাদ ও মুর্শীদ ছিলেন। উল্লেখ্য ইয়াহিয়া মানেরী ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এসব তথ্য তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা শাহ শোয়ায়েব কর্তৃক রচিত *মানাকিব-আল-আসফিয়া* সূত্রে অবগত হওয়া যায়।[৭] তাই বলা যায়, ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই মহিসন্তোষ উচ্চ শিক্ষার একটি কেন্দ্র পরিণত হয়েছিল। জৌনপুরের বিখ্যাত সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে লেখা বিশিষ্ট সূফী সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর একটি পত্র (মকতুবাত) থেকে জানা যায়, মহিসুনে (মহিসন্তোষ) সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া তরীকার অনেক সূফী-সাধক শায়িত আছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উক্ত পত্রে মহিসন্তোষকে মহিসুন বলা হয়েছে।[৮] সম্ভবত সে সময়ে স্থানটি মহিসুন নামেই পরিচিত ছিল। তবে বর্তমানে স্থানীয়ভাবে কেউ কেউ মহিসন্তোষকে 'মাইগঞ্জ' বলে থাকেন। তবে 'মাইগঞ্জ' নামটি সম্ভবত পরবর্তীকালে মুসলমানদের দেয়া। উল্লেখ্য, এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে অফিস আদালতে সরকারীভাবে ফার্সী ভাষার প্রচলন হয়। ধারণা করা যায়, ফার্সী শব্দ 'গেঞ্জ' থেকে 'গঞ্জ' শব্দের উৎপত্তি। দেশীয়ভাবে গঞ্জ শব্দের অর্থ নদী তীরে হাট-বাজার বা ব্যবসা কেন্দ্র। মহিসন্তোষ নগরী আত্রাই নদীর তীরে অবস্থিত বলে অনুমান করা যায়, সেযুগে এখানে প্রসিদ্ধ নদী-বন্দর ছিল। আর সে কারণেই মনে হয় মহিসন্তোষ মাইগঞ্জ নামে পরিচিতি পেয়েছে। তখন মাইগঞ্জের সঙ্গে রাজধানী শহর গৌড় ও অন্যান্য নগরীর জলপথে সুষ্ঠু যোগাযোগ ছিল। উল্লেখ্য, বাংলার সুবাদার ইসলাম খান চিশ্‌তী ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে মহিসন্তোষ হয়ে (আত্রাই নদী পথে) ঘোড়াঘাট পৌছান। যদিও অতীতের সেই গঞ্জ বা বাজার এখন আর সেখানে কিছুই নেই তথাপি এই ঐতিহাসিক নগরীর স্মৃতিকথা এখনো মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়।

বাংলার দুশো বছর (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিঃ) স্বাধীন সুলতানী আমলের ইলিয়াস শাহী বংশের মহাপন্ডিত (আল-ফাজিল ওয়া আল-কামিল) সুলতান রুকন উদ্দীন বারবক শাহের শাসনামলে (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিঃ) মহিসন্তোষ নগরীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়

৭. আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর পত্রের জন্য দ্রষ্টব্যঃ সুখময় মুখোপাধ্যায়, **বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানের আমল**, কলকাতা, ভারতী বুক ষ্টল, ১৯৯৬, পৃ. ৫০৮।

৮. শামসুদ্দীন আহমেদ, **ইসক্রিপমনস অব বেংগল**, ভল্যুম-৪, রাজশাহী, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, ১৯৬০, পৃ. ৯০।

এবং ঐ সুলতানের নামানুসারে এর নামকরণ হয় 'বারবকাবাদ'। মহিসন্তোষে ৫ ৮৭৬ হিজরী/১৪৭১ খ্রিস্টাব্দের একটি শিলালিপি সূত্রে সরকারী পর্যায়ে এই স্থান নামে 'বারবকাবাদ' শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার সমর্থন পাওয়া যায়।[৯] ঐ শিলালিপি 'বারবকাবাদ মাকান' নামক বিশেষ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, যার অর্থ হিস বারবকাবাদকে একটি নগর হিসাবে গ্রহণ করা যায়। ঐ শিলালিপি সূত্রে আ অবগত হওয়া যায়, সুলতান রুকন উদ্দীন বারবক শাহের শাসনামলে মহিসন্তোষ এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিভাজনের সরলস্কর (সেনাধ্যক্ষ) ও উজির (প্রশাস কর্মকর্তা) ছিলেন উলুঘ ইকরার খান। বারবকাবাদ মাকান ইকরার খানের অধি কর্মকর্তা ছিলেন আশরাফ খান।[১০] তাঁকে বারবকাবাদের প্রশাসনিক দায়িত্ব দে হয়েছিল। উলুঘ ইকরার খানের পর খান আজম বারবকাবাদ মাকানের উ ছিলেন।[১১] উল্লেখ্য, উলুঘ তুর্কী শব্দ এবং তা একজন প্রশাসনিক ও সামরিক উর্ধ্ব কর্মকর্তাকে বুঝায়। শিলালিপিতে 'মাকান' শব্দ উল্লেখ থাকায় বারবকাবাদ আবাস্থল (A Place of Residence) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১২] কাজেই ব যায়, বারবকাবাদ অঞ্চলের প্রশাসনিক ও সামরিক দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীগণ এই শহরে অবস্থান করতেন। এবং এটি যে একটি মশহুর শহর ছিল ঐ লিপিতেই প্রতিভাত হয়েছে। মহিসন্তোষের ইতিহাস পুনর্গঠনে এর গুরু অনস্বীকার্য। মহিসন্তোষ থেকে এযাবৎ চারটি মসজিদের শিলালিপি উদ্ধার ক হয়েছে। সেসবের মধ্যে দুটি কলকাতা চিত্রঘরে, একটি রাজশাহী বরেন্দ্র যাদুঘ এবং অতি সম্প্রতি প্রাপ্ত একটি শিলালিপি পাহাড়পুর যাদুঘরে রক্ষিত হয়েছে।

বাংলার দু'শো বছর (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিঃ) স্বাধীন সুলতানী আমলের মুদ্রা বারবকাবাদ টাঁকশালের নাম উৎকীর্ণ হওয়ায় বারবকাবাদকে টাঁকশাল শহর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১৩] ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান রুকন উদ্দীন বারবকশা (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিঃ) এই টাঁকশাল প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান রুকন উদ্দীন বারব শাহ ব্যতীত সুলতান শামসুদ্দীন মুজাফ্ফর শাহ (১৪৯১-১৪৯৩ খ্রিঃ) এবং হোসে শাহী বংশের সুলতান নাসির উদ্দীন নূসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রিঃ) বারবকাবা টাঁকশাল থেকে তাঁদের মুদ্রা জারী করেন।[১৪] ধারণা করা যেতে পারে, এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বারবকাবাদ (মহিসন্তোষ) টাঁকশাল থেকে প্রয়োজনী

---

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।
১২. আবদুল করিম, **করপাস অব দি মুসলিম কয়েন্স অব বেংগল** (ডাউট টু ১৫৩৮ এডি), ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১৯৬০, পৃ. ১৬২।
১৩. এম. আর. তরফদার, **হোসেন শাহী বেংগল**, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১৯৬৫, পৃ. ১১৪।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪-১১৫।

মুদ্রা মুদ্রিত হয়েছে। উল্লেখ্য, বারবকাবাদ টাঁকশালের বেশ কয়েকটি মুদ্রা রাজশাহী বরেন্দ্র যাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

বাংলার হোসেনশাহী শাসনামলের (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রিঃ) প্রাদেশিক শহরের তালিকায় 'বারবকাবাদ' নাম যুক্ত হয়েছে।[১৫] এতে সহজেই অনুমান করা যায়, বারবকাবাদ (মহিসন্তোষ) হোসেনশাহী রাজ্যের অন্যতম প্রাদেশিক রাজধানী শহরে উন্নীত হয়েছিল। অন্যদিকে বারবকাবাদ টাঁকশাল শহর হিসাবেও এর গৌরব অক্ষুন্ন রাখে। সুলতান নাসির উদ্দীন নুসরত শাহের মুদ্রা বারবকাবাদ টাঁকশাল থেকে মুদ্রিত হওয়ায় এই মতকে আরো প্রতিষ্ঠিত করেছে। বারবকাবাদ পরবর্তীকালে (মুঘল আকবর পূর্ব যুগ, ১৫৩৮-১৫৭৬ খ্রিঃ) বাংলার উল্লেখযোগ্য প্রশাসন কেন্দ্র ছিল তা সংগত কারণেই অনুমান করা যায়।

১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর টোডরমলকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। টোডরমল বাংলায় এসে দেশের আয় বৃদ্ধি ও রাজস্ব আদায়ে শৃঙ্খলা ফিরে আনার জন্যে সুবা বাংলাকে ১৯ সরকার (প্রশাসনিক বিভাগ/জেলা) ও ৬৮৮ মহলে (রাজস্ব ইউনিট) বিভক্ত করেন। টোডরমল কর্তৃক বিভক্ত সুবা বাংলার ১৯ সরকার হলো ঃ ১. উদম্বর (তান্ডা নামে পরিচিত), ২. জান্নাতাবাদ বা লখনৌতি, ৩. ফতেহাবাদ, ৪. মাহমুদাবাদ, ৫. খলিফাতাবাদ, ৬. বাকলা, ৭. পূর্ণিমা, ৮. তাজপুর, ৯. ঘোড়াঘাট, ১০. পাঞ্জারা, ১১. বারবকাবাদ, ১২. বাজুহা, ১৩. সোনারগাঁ, ১৪. সিলেট, ১৫. চিটাগাং, ১৬. শরিফাতাবাদ, ১৭. সুলাইমানাবাদ, ১৮. সাতগাঁ, ১৯. মান্দারন।[১৬]

উল্লেখ, সুবা বাংলার ১৯ সরকার-এর মধ্যে 'সরকার বারবকাবাদ' বরেন্দ্র ভূমির অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত ছিল। এবং এই সরকার-এর কেন্দ্রীয় শহর ছিল মহিসন্তোষ। টোডরমলের বন্দোবস্তে সরকার বারবকাবাদ-এর মহল সংখ্যা ছিল ৩৮ এবং এর রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,৭৪,৫১,৫৩২ দাম (৪,৩৬,২৮৮.৩০ টাকা)। বারবকাবাদ সরকার এর ৩৮ মহল হলোঃ ১. আমরুল, ২. বারবকাবাদ সদর, ৩. বসউল/বাসদোল, ৪. পোলাহার, ৫. বাসতোল, ৬. বরবরিয়া, ৭. বনগাঁ, ৮. পালতাপুর. ৯. ছাদিয়া বাজু, ১০. চৌড়া, ১১. জিয়াসিদ্ধ, ১২. চৌগাঁ, ১৩. চাঁদলাই, ১৪. জনাসু, ১৫. সুখ শহর, ১৬. ধামিন, ১৭. দাউদপুর, ১৮. সংকরদল, ১৯. শিকারপুর, ২০. শেরপুর, ২১. বহামপুর, ২২. তাহিরপুর, ২৩. কাজীহাটি, ২৪. করদহ, ২৫. গুজরহাট, ২৬. খাস, ২৭. জগদলগঞ্জ, ২৮. গোবিন্দপুর, ২৯. কালীগাই কাথা, ৩০. খরাল, ৩১. কোদানগর, ৩২. কালীগাঁ, ৩৩. লস্করপুর, ৩৪. মজিলপুর/মালজিপুর, ৩৫. মসিদা, ৩৬. মনসমালি, ৩৭. মাহমুদপুর. ৩৮.

---

১৫. আবুল ফজল, **আইন-ই আকবরী**, ভল্যুম-২ (এইচ. এস. জেরেট অনুঃ) পৃ. ১৪২-১৫০।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০। বিস্তারিত দেখুন ঃ মোঃ আব্দুল করিম (আমার,) **বারবকাবাদ অঞ্চলের প্রশাসন** ঃ একটি সমীক্ষা (১২০০-১৭৫৭ খ্রিঃ), এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯, পৃ. ১০-১৩৫।

উজিরপুর।[১৭] সম্রাট আকবরের শাসনামলে বারবকাবাদ সরকার-এর সামরিক সংস্থান ছিল ৫০টি অশ্বারোহী ও ৭০০০ পদাতিক বাহিনী।[১৮] সরকার বারবকাবাদ বর্তমান রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা এবং ভারতের পশ্চিম বঙ্গে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার কিয়দাংশ ব্যাপী বিস্তৃত ছিল।[১৯]

আলোচ্য মহিসন্তোষ ২৪° থেকে ২৫° উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮° থেকে ৮৯° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এই নগরীর আয়তন প্রায় ৫ বর্গ কিঃ মিঃ। এই নগরীর উত্তর-পশ্চিমপার্শ্ব দিয়ে আত্রাই/আত্রেয়ী নদী বহমান। পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত সমতল ভূমি।

যুগে যুগে প্রশাসনিক প্রয়োজনেই প্রশাসন অঞ্চল পুনর্গঠিত হয়; প্রশাসনিক বিভাজন ঘটে। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে টোডরমলের বন্দোবস্তে বিভক্ত সুবা বাংলার সরকার পদ্ধতি এক শতাব্দীরও আধিককাল টিকে থাকে। অতঃপর সুবাদার মুর্শিদ কুলী খান পূর্বোক্ত বন্দোবস্তের পুনর্গঠন করে ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে সুবা বাংলাকে ১৩ চাকলা ও ১৬৬০ পরগনায় বিভক্ত করেন।[২০] এই বিভক্তির ফলে মহিসন্তোষ বারবকাবাদ সরকার-এর কেন্দ্রীয় শহরের মর্যাদা হারিয়ে এর উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি পরগনাসহ ঘোড়াঘাট চাকলাভুক্ত হয়।

মুর্শিদ কুলী খানের পরে তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন খানের শাসনামলে (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রিঃ) বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একটি যুক্ত শাসনে পরিণত হয়। সুজাউদ্দীন খান তাঁর প্রশাসনিক সুবিধার্থে যুক্ত বাংলাকে চারটি ডিভিশনে/বিভাগে বিভক্ত করেন। ১. মুর্শিদাবাদ বিভাগ-পশ্চিম ও মধ্য বাংলা এবং উত্তর বাংলার কিছু অংশ; ২. ঢাকা বিভাগ-দক্ষিণ বাংলা এবং সিলেট ও চট্টগ্রামসহ পূর্ব বাংলা, এবং উত্তর বাংলার বাঁকি অংশ; ৩. বিহার বিভাগ এবং ৪. উড়িষ্যা বিভাগ। একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে নবাব নাজিম সুজাউদ্দীন খান নিজে প্রথম বিভাগ শাসন করতেন এবং অন্য তিনটি বিভাগে তিনজন নায়েব নাজিম বা ডেপুটি গভর্ণর নিযুক্ত করেন।[২১] সুজা উদ্দীন খান কর্তৃক বিভক্ত প্রথম বিভাগের (মুর্শিদাবাদ বিভাগ) মধ্যে আলোচ্য মহিসন্তোষসহ অত্র অঞ্চল পলাশীর বিপর্যয় (১৭৫৭ খ্রিঃ) পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। পলাশীর পরে এদেশে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ঘন ঘন প্রশাসনিক পরিবর্তন এবং যোগাযোগের অব্যবস্থার কারণে এই জনপদের পরিবর্তে নতুন জনপদ গড়ে ওঠে। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে "কোনো এক সময়ে এখানে মহামারী দেখা দিলে এই

---

১৭. *আইন-ই-আকবরী*, পৃ. ১৫০।

১৮. *বারবকাবাদ অঞ্চলের প্রশাসন*, পৃ.-১০৪।

১৯. আব্দুল করিম, **মুর্শীদ কুলী খান এন্ড হিজ টাইমস**, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১৯৬৩, পৃ.-৭৯। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খান সৃষ্ট বাংলার ১৩ চাকলা ঃ ১. বালেশ্বর ২. হিজলি, ৩. মুর্শিদাবাদ, ৪. বর্ধমান, ৫. সাতগাঁ, ৬. ভূষণা , ৭. যশোর, ৮. আকবরণগর, ৯. ঘোড়াঘাট, ১০. কড়াইবাড়ী, ১১. জাহাঙ্গীরনগর, ১২. সিলেট, ১৩. ইসলামাবাদ বা চট্টগ্রাম।

২০. **হিষ্ট্রি অব বেংগল**, ভল্যুম-২, পৃ. ৪২৬।

২১. **তবকাত-ই-নাসিরী**, পৃ. ৪৮।

জনপদ জনশূন্য হয়ে পড়ে।" এই জনশ্রুতি বাংলার রাজধানী গৌড় শহরের মহামারীর কথা স্মরণ (১৫৭৫ খ্রিঃ) করিয়ে দেয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমান গ্রন্থকার নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলাধীন ফার্সীপাড়া উচ্চ-বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাবস্থায় (১৯৬২-৬৬ খ্রিঃ) কয়েকবার মহিসন্তোষ পরিদর্শন করেন। সে সময়ে মহিসন্তোষ নগরী সম্পূর্ণ কাঁটাজাতীয় উদ্ভিদ এবং প্রত্ন-জঞ্জালে পরিপূর্ণ ছিল। তখন এর ভিতরে প্রবেশ দুর্ভেদ্য ছিল ; বড় বড় পাথর খন্ড এবং ইট-পাটকেলের ধ্বংসস্তূপ, বিষধর সাপ ও বন্যজন্তুর আবাসস্থল ছিল। বর্তমানে সেখানে দেখা যাবে উদ্বাস্তুদের বিক্ষিপ্ত বসতবাটি, বিশষত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এরশাদ সরকারের সময়ে এখানে উদ্বাস্তুদের আবাসন হিসাবে গড়ে উঠেছে গুচ্ছ গ্রাম। স্থানীয়ভাবে জানা যায়, বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় (১৯৭১) এখানকার অসংখ্য ইট ও পাথর খন্ড অন্যত্র পাচার হয়েছে। বর্তমানে মহিসন্তোষের চারপাশে দু'চার মাইল জুড়ে এমন কোনো ঘর-বাড়ী নেই যেখানে এই ধ্বংসস্তুপের ইট বা পাথর খন্ড স্থানান্তরিত হয়নি। বস্তুত ধ্বংসপ্রাপ্ত মহিসন্তোষ নগরীর ইট-পাটকেলে কোথাও কোথাও পরিপূর্ণ বাড়ী বা মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

মহিসন্তোষে ইষ্টক নির্মিত প্রাচীর বেষ্টিত দুটি সমাধিসৌধ রয়েছে। এর একটিতে মহিসন্তোষ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা তাকীউদ্দীন আল–আরাবী শায়িত আছেন। কিন্তু অন্য সমাধিটিতে কে শায়িত আছেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায় না। জনশ্রুতিতে এটি তাঁর মায়ের (জানানা) কবর। যাহোক, স্থানীয়ভাবে এটি পীরের দরগা বলে পরিচিত। প্রতিবছর চৈত্রমাসে সেখানে ওরস-মাহফিল ও শিরনী-সালাতের আয়োজন হয়ে থাকে। মহিসন্তোষ দরগার দক্ষিণ-পূর্বে ৫০০ গজ দূরে আর একটি অনাবৃত পাকা সমাধি রয়েছে। এটি 'উজিরের মাযার' বলে পরিচিত। অন্যত্র, *তবকাত-ই-নাসিরীতে* বর্ণিত হয়েছে, মহিসন্তোষে বাংলার দ্বিতীয় শাসক ইযযুদ্দীন মুহম্মদ শীরান খলজি শায়িত আছেন।[২২] এখানে 'উজিরের মাযার' বলে কথিত পাকা সমাধিটি শীরান খলজীর মাযার হওয়াই সম্ভব।

পাকিস্তান আমল পর্যন্তও মহিসন্তোষ ধ্বংসস্তুপের চারপাশে প্রায় ২০০ ঘর সাঁওতাল ও শবরদের বাস ছিল। বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিপ্লবে এরা অন্যত্র গমন করেছে। মহিসন্তোষের বিস্তৃত ভিটে-মাটিতে এখনো উৎখননকার্য পরিচালনা করলে হয়তো প্রচুর ঐতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়ে পড়বে। অতি সম্প্রতি এখানে চাষাবাদ করার সময় তিনটি প্রস্তর মূর্তি এবং কিছু তামার জিনিসপত্র উদ্ধার হয়েছে।[২৩] মহিসন্তোষ থেকে সুলতানী বাংলার রাজধানী শহর গৌড় নগরী পর্যন্ত প্রাচীন পাকা

---

২২. দৈনিক সোনালী সংবাদ রাজশাহী, ০৮/০৩/১৯৯৮ ইং।

রাস্তার চিহ্নাবশেষ এখনো কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয়। এতে প্রাচীন বানগ (কোটিবর্ষ), জগদ্দল মহাবিহার, পাহাড়পুর মহাবিহার, আগ্রাদ্বিগুন বিহার প্রভৃ ঐতিহাসিক স্থানের সঙ্গে মহিসন্তোষের সড়কপথে যে যোগাযোগ ছিল তা সহজে অনুমান করা যায়। মোটকথা, এ স্থানের স্থাপত্য ইমারত ও প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বি উপকরণের সাক্ষ্যে বলা যায়, খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক হতে ষোড়শ শতক পর্য মহিসন্তোষ সামরিক ও প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বাংল গৌরবময় অতীত ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করতে হলে মহিসন্তোষ সম্পর্কে আে গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এদিে নেকনজর দিলে বাংলার ইতিহাসের আরো নতুন উৎসের সন্ধান মিলবে বলে আ করা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইযযুদ্দীন মুহম্মদ শীরান খলজী ও মহিসন্তোষ

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর নেতৃত্বে তুর্কীরা ১০ মে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে লক্ষণ সেনের রাজধানী নদীয়া দখল করেন।[১] ফলে বাংলাদেশে মুসলিম শাসন শুরু হয়। লক্ষণ সেন নদীয়া থেকে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, *তবকাত-ই-নাসিরীতে* লক্ষণ সেনের রাজধানীর নাম 'নওদীয়াহ' (Nudiah) লেখা হয়েছে।[২] এই নওদীয়াহ কোথায়? এই প্রশ্নের জবাবে ঐতিহাসিকদের মধ্যে আজও মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক অনেক লেখকই বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বিজিত নওদীয়াহকে নদীয়া (বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া জেলায় নবদ্বীপ) বলে চালিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে কেউ কেউ নবদ্বীপের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বিজিত 'নওদীয়াহ' নদীয়া/নবদ্বীপ নয়। এই মতের পক্ষে বলা হয়েছে, নওদীয়াহ (নওদহ-নওদা) রাজশাহী জেলায় মহানন্দা ও পুনর্ভবা নদীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে অবস্থিত রহনপুর (এটি বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন)। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ আহম্মাদ হাসান দানী বলেন, "Nudia is a fortified place to be indentified with the ruins of Nauda near Rahanpur at the junction of Mohananda and Punarbhaba about 16 miles South East of Gour."[৩] বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ আ. ক. ম. যাকারিয়া *তবকাত-ই-নাসিরী* অনুবাদ ও সম্পাদনাকালে নদীয়া/নবদ্বীপ এবং রহনপুরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা করে বলেন, লক্ষণ সেনের রাজধানী (নওদীয়াহ) ছিল রহনপুর।[৪] আরো অনেকেই এই মত সমর্থন করেন। প্রায় ১৫ বর্গমাইল ব্যাপী বিস্তৃত রহনপুর অদ্যাবধি নওদা এবং এর দুর্গের

---

১. পরমেশ্বর লাল গুপ্ত "দি ডেট অব বখতিয়ার খলজীস অক্যুপেশন অব গৌড়" জর্নাল অব দি বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, ভল্যুম-৪, ১৯৭৫-৭৬, পৃ. ৩৩-৩৪।

২. তবকাত-ই -নাসিরী, পৃ.-২২।

৩. এ. এইচ. দানী, "দি ডেট অব বখতিয়ার রেড অন নদীয়া", ইনিয়ান হিস্ট্রিক্যাল কোয়ার্টার্লি, ভল্যুম-৩০, কলকাতা, ১৯৫৪, পৃ. ১৪৫।

৪. তবকাত-ই-নাসিরী, পৃ. ২২, পাদটীকা দ্রষ্টব্য ঃ

ধ্বংসাবশেষটি 'নওদার বুরুজ' বলে কথিত হয়ে আসছে। তাই বলা যেতে পারে, ব: বিজয় করতে এসে বখতিয়ার খলজীকে শতাধিক দূরবর্তী এবং খরস্রোতা গঙ্গা পা: হয়ে নবদ্বীপ আক্রমণের কোন প্রয়োজন হয় নি।

বখতিয়ার খলজী নওদীয়াহ দখলের পরে প্রায় সমগ্র বরেন্দ্র/বারিন্দ অঞ্চলে: উপর তাঁর জয় সম্প্রসারিত করেন এবং বিজিত অঞ্চল শাসনের সুবিধার্থে দেবকোটে তাঁর সামাজ্যিক (Emperial capital রাজধানী (দারুল-মূলক) স্থাপন করেন *History of Bengal*, vol-2 অনুসারে বখতিয়ার খলজীর অধিকৃত রাজ্য উত্তরে দেবকোট হয়ে রঙ্গপুর (রংপুর) পর্যন্ত, দক্ষিণে গঙ্গা (পদ্মা, পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং পশ্চিমে অধিকৃত বিহার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলও তাঁর অধীনে ছিল।[৫] বখতিয়ার খলজী তাঁর বিজিত অঞ্চলকে তিন 'ইকতা'য় (প্রশাসনিক ইউনিট) বিভক্ত করেন। এসবের মধ্যে তবকাত-ই-নাসিরীতে বর্ণিত মাসেদা-সন্তোষ (মহিসন্তো ষ) উল্লেখযোগ্য।[৬] মহিসন্তোষ ইকতার 'মুকতা' (প্রশাসক) ছিলেন বখতিয়ার খলজীর অন্যতম বিশ্বস্ত অনুচর ও সেনাধ্যক্ষ উযযুদ্দীন মুহম্মদ শীরান খলজী।

শীরান (শীরান শব্দের অর্থ সাহসী সিংহ) খলজী বখতিয়ার খালজীর বিশ্বস্ত আমিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী, কর্মঠ এবং সুচতুর ছিলেন। তাঁর এসব গুণাবলী এতো অধিক ছিল যে, বখতিয়ার খলজী যেদিন নওদীয়াহ অধিকার করেন সেদিন তিনি একাকী একটি জঙ্গলে মাহুতসহ ১৮টি হাতী ঘিরে রেখেছিলেন।[৭] এতে তাঁর সাহসীকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিব্বত ও কামরূপ অভিযানের প্রাক্কালে বখতিয়ার খলজী মুহম্মদ শীরান খলজীও তাঁর ভাই আহমদ শীরান খলজীকে গঙ্গাতরীর (তান্ডা) দক্ষিণাংশে রাঢ় অঞ্চল অধিকারের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন।[৮] মুহম্মদ শীরান খলজী সেই বিজয়াভিযান সমাপ্ত করে যখন লখনৌতি পৌঁছান তখন দেবকোটে বখতিয়ার খলজী কুচক্রী আলী মর্দান খলজীর হাতে নিহত হন। বলা হয়ে থাকে, তিব্বত অভিযানে ব্যর্থ বখতিয়ার খলজী পরাজয়ের গ্লানিতে দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তিন দিন যাবৎ কেউ তাঁর দর্শন পায় নি। সে সময়ে কোনো উপায়ে আলী মর্দান খলজী (নাটারীর মুকতা) বখতিয়ারের কক্ষে প্রবেশ করে তাঁকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে (আগষ্ট-১২০৬)।[৯] এই সংবাদ লখনৌতি পৌঁছামাত্র শীরান খলজী সসৈন্যে দ্রুতগতিতে দেবকোট ফিরে আসেন এবং পরলোকগত প্রিয় নেতার দাফন-কাফন সম্পন্ন করেন। এই অপ্রীতিকর ঘটনায় সৃষ্ট পরিস্থিতি নিরসনকল্পে দেবকোটে উপস্থিত খলজী আমির ও সৈনিকগণ শীরান খলজীকে তাঁদের নেতা নির্বাচন করেন এবং দেবকোটের (বাংলার) শাসনভার গ্রহণের জন্যে তাঁকে অনুরোধ

---

৫. আবদুল করিম, **বাংলার ইতিহাস ঃ সুলতানী আমল**, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ২০।
৬. **তবকাত-ই-নাসিরী**, পৃ. ২৯-৩০।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩।
৮. রাখাল দাস, **বাঙ্গালার ইতিহাস**, খন্ড-২, ১ম দেজ সংস্করণ , কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ২৩।
৯. **তবকাত-ই-নাসিরী**, পৃ. ৫৭২-৫৭৩।

করেন। শীরান খলজী এই অনুরোধ রক্ষা করে অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে দেবকোটের শাসনভার গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বখতিয়ার খলজীর বিজয় থেকে দেবকোটই বাংলার প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থলে (রাজধানী) পরিণত হয়েছিল। এবং ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে ইউওয়াজ খলজী পুনরায় লখনৌতিতে বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন।

শীরান খলজী শাসনভার গ্রহণ করে দেবকোট থেকেই বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর সিংহাসন নিষ্কণ্টক ছিল না। শাসনভার গ্রহণের পরে চারিদিক থেকে বখতিয়ার খলজীর হত্যাকারীর উপর্যুক্ত শাস্তি প্রদানের দাবী উত্থাপিত হতে থাকে। বিদ্রোহীদের ক্রমাগত চাপের মুখে তিনি বখতিয়ার খলজীর চিহ্নিত হত্যাকারী আলী মর্দান খলজীকে শাস্তি প্রদানের জন্যে তাঁর (আলী মর্দানের) ইকতা নরণকোই (নরকোটী-নাটারী-নাটোর) আক্রমণ করেন। এখানে উভয় পক্ষে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে আলী মর্দান খলজী পরাজিত হলে তাঁকে হাজী বাবা ইস্পাহানী নামে এক কোতওয়ালের অধীনে বন্দী করে রাখা হয়।[১০]

আলী মর্দান খলজীকে বন্দী করেও শীরান খলজী শত্রুমুক্ত হতে পারেন নি। চারদিকে তখনও থমথমে অবস্থা বিরাজ করছিল। কারণ প্রয়াত নেতা বখতিয়ার খলজীর উচ্চপদস্থ আমীরগণ প্রায় সবাই ধারণা করতেন, বাংলার সিংহাসনে তাঁদের সবারই সমান দাবী রয়েছে। এধরনের সমধিকারের দাবী তাঁদের মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিচক্ষণ শীরান খলজী তাঁদের সকলকেই স্ব স্ব পদে বহাল রেখে সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় ছিলেন। তিনি কখনো ক্ষমতার ঔদ্ধত্য দেখাননি বা বিদ্রোহী আলী মর্দানের সমর্থকগণকে শাস্তি প্রদান করেন নি, কিংবা বিহারের দিকেও হস্ত প্রসারিত করেন নি। কারণ বিহার বিজয়ের প্রচেষ্টায় দিল্লীর সুলতান কুতুব উদ্দীন আইবকের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের সমূহ সম্ভবনা ছিল। এছাড়া তিনি প্রকাশ্যে সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন নি, যদিও অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন।[১১] তিনি অত্যন্ত আত্মসম্মানবোধ ও জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন

শীরান খলজী শাসনভার গ্রহণ করে বেশিদিন শান্তি ভোগ করতে পারেন নি। আলী মর্দান খলজী নরকোটির কোতওয়াল হাজী বাবা ইস্পাহানীকে বশীভূত করে পলায়ন করেন এবং সোজা দিল্লীতে গিয়ে সুলতান কুতুব উদ্দীন আইবকের স্মরণাপন্ন হন।[১২] আলী মর্দান সুলতান কুতুব উদ্দীনকে বাংলা আক্রমণ করার জন্যে প্ররোচিত করেন। কুতুব উদ্দীন আইবক বাংলায় আধিপত্য বিস্তারের এই সুযোগ উপেক্ষা করেন নি। কায়েমাজ রুমী নামে কুতুব উদ্দীনের জনৈক সেনাপতি সে সময়ে অযোধ্যায় ছিলেন। কুতুব উদ্দীন কায়েমাজ রুমীকে বাংলা আক্রমণের নির্দেশ পাঠান। সুলতানের নির্দেশে কায়েমাজ রুমী লাখনৌতি অভিমুখে তাঁর সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করে (১২০৭ খ্রিঃ) কুশী নদী অতিক্রম করলে গাংগুরী/গাংকুরীর মুকতা হুসাম উদ্দীন

১০. রাখাল দাস, **বাঙ্গালার ইতিহাস**, খন্ড-২, পৃ. ২৩।
১১. **ক্যাম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া**, ভল্যুম-২, পৃ. ৪৮।
১২. রাখাল দাস, **বাঙ্গালার ইতিহাস**, খন্ড–২, পৃ. ২৩।

ইউওয়াজ খলজী (শীরান খলজীর সমর্থক) বিনা যুদ্ধে কায়েমাজ রুমীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। হুসাম উদ্দীনের আত্মসমর্পণ শীরান খলজীকে দুর্বল করে দেয় এবং বাংলার ভাগ্যকে বিপদাপন্ন করে তোলে। শীরান খলজী এই মুহূর্তে কায়েমাজ রুমীর বাহিনীর (দিল্লীর সাহায্যপুষ্ট) সঙ্গে যুদ্ধ করা নিরর্থক মনে করেন এবং দেবকোট পরিত্যাগ করে সসৈন্যে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করেন। কায়েমাজ রুমী বিনাযুদ্ধে দেবকোট অধিকার করেন এবং দিল্লীর সুলতানের প্রতিনিধিরূপে হুসাম উদ্দীন ইউওয়াজ খলজীকে দেবকোটের (বাংলার) শাসনকর্তা নিযুক্ত করে অযোধ্যার পথে যাত্রা করেন। এদিকে কায়েমাজ রুমীর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে শীরান খলজী তাঁর অনুসারীদের পরামর্শে এবং সহযোগিতার দেবকোট পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু কায়েমাজ রুমী এই সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ গতিপথ পরিবর্তন করে দেবকোটে ফিরে আসেন এবং পলায়নের পূর্বেই শীরান খলজীকে আক্রমণ করেন (১২০৮ খ্রিঃ)। এই পাল্টা আক্রমণে শীরান খলজী ও তাঁর অনুসারীরা পরাজিত হয়ে মাসেদা-সন্তোষ (মহিসন্তোষ) অভিমুখে পলায়ন করেন।[১৩] মাসেদা-সন্তোষে আশ্রয়ের পরে শীরান খলজীর অনুসারীদের মধ্যে অন্তবিরোধ শরু হয়। এতেও আলী মর্দান খলজীর কুটচাল ছিল বলে ধারণা করা যায়। যা হোক, এই অন্তবিরোধের ফলেই শীরান খলজী তাঁরই এক অনুসারীর হাতে নিহত (১২০৮ খ্রিঃ) হন। বাংলার দ্বিতীয় শাসক সাধু পুরুষ মুহম্মদ শীরান খলজী এই মাসেদা-সন্তোষেই (মহিসন্তোষ) সমাহিত আছেন।[১৪]

মহিসন্তোষে প্রচলিত কিংবদন্তী সূত্রে জানা যায়, শীরান খলজী পাশ্ববর্তী কোনো এক হিন্দু রাজা বা সামন্তের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। প্রচলিত কিংবদন্তীর পক্ষে একটি যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। তা হলো, কামরূপরাজ কামেশ্বর বা কান্তাশ্বরের সঙ্গে সুলতান রুকন উদ্দীন বারবকশাহের (১৪৬৯-১৪৭৪ খ্রিঃ) সেনাপতি পীর ইসমাইল গাজীর যে যুদ্ধ সংঘটিত (১৪৭৪ খ্রিঃ) হয় তা মহিসন্তোষ নামক স্থানেই হয়েছিল।[১৫] উল্লেখ্য, এই যুদ্ধে ইসমাইল গাজী ও তাঁর ভাতিজা মুহম্মদ এবং মাত্র ১২ জন পাইক ছাড়া সম্পূর্ণ বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায় যাদের মরদেহ ঐ যুদ্ধ ক্ষেত্রেই সমাহিত করা হয়। পরে সেখানে ১২জন পাইকের স্মরণে 'বার পাইকা' দুর্গ নির্মাণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজা কামেশ্বর পরে ইসমাঈল গাজীর অলৌকিক কার্যকলাপের ফলে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[১৬] এই যুদ্ধ বাংলার ইতিহাসে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। মনে হয়, এই যুদ্ধের স্মৃতি মহিসন্তোষে

১৩. প্রাগুক্ত।
১৪. **তবকাত-ই নাসিরী**, পৃ. ৪৮।
১৫. হাসান আলী চৌধুরী**রংপুরে ইসলাম**, ইফা বা, ১৯৯৪, পৃ. ৬৬।
১৬. আবদুল করিম, **বাংলার ইতিহাস ঃ সুলতানী আমল**, পৃ. ২৬৭।

কিংবদন্তীর জন্ম দিয়েছে। যাহোক, শীরান খলজী ও পীর ইসমাইল গাজীর নাম আজও মহিসন্তোষ অঞ্চলে মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে পীর ইসমাঈল গাজী সম্পর্কে কিছু বলার আছে। ইসমাঈল গাজীর মৃত্যু সম্পর্কে নিম্নরূপ আলোচনা পাওয়া যায়। রংপুর কাঁটাদুয়ারে ইসমাঈল গাজীর মাযারের মুতাওয়াল্লী পীর মুহম্মদ সাত্তারী কর্তৃক ফার্সী ভাষায় রচিত *রিসালাতুশ শুহাদা'* (ইসমাইল গাজীর বৃত্তান্ত), রচনাকাল ২২ শাবান ১০৪২ হিজরী মোতাবেক ২২ ফেব্রুয়ারী ১৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ, অনুসারে মহিসন্তোষে যুদ্ধের পর সুলতান রুকন উদ্দীন বারবক শাহ ঘোড়াঘাটের হিন্দু ফৌজদার ভান্দসী রায়ের চক্রান্তে ইসমাঈল গাজীর শিরচ্ছেদ করার নির্দেশ দেন (১৪ শাবান, ৮৭৮ হিজরী মোতাবেক ১৪ জানুয়ারী ১৪৭৪ খ্রিঃ)।[১৭] কথিত আছে, ইসমাইল গাজীর খন্ডিত মস্তক সুলতানের কাছে নীত হলে তিনি ভান্দরী রায়ের সমস্ত কারসাজী ধরে ফেলেন এবং স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতা ও নিবুর্দ্ধিতার জন্য বিলাপ করতে থাকেন। অতঃপর সুলতানের আদেশে রাজধানীর রাজ সমাধিক্ষেত্রে ইসমাইল গাজীর খন্ডিত মস্তক শ্রদ্ধার সাথে দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। পরে কথিত অলৌকিক কারণে গাজী সাহেবের মস্তক রংপুরে বর্তমান পীরগঞ্জ থানার কাঁটাদুয়ারে এবং দেহ হুগলী জেলার মান্দারনে সমাহিত হয়। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য'-এর ৮১ পৃষ্ঠায় গাজী বিজয় কাব্য প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

খোঁটাদুরের পীর ইসমাইল গাজী।
গাজীর বিজয়ে সেহ মোক হইল গাজী।

সুখময় মুখোপাধ্যায় ইসমাইল গাজী প্রসঙ্গে লিখেছেন, ইসমাইল তাঁর মৃত্যুর পরে যে মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করেছেন, তা সত্যিই অসামান্য। মুসলমানরা তাঁকে শুধু গাজী বলেই আখ্যা দেন নি, পীর বলেও শ্রদ্ধা করেন। কালক্রমে পীর ইসমাইল হিন্দু জনগোষ্ঠির মনেও শ্রদ্ধার আসন করে নিয়েছেন, আর সে কারণেই কাঁটাদুয়ার ও মান্দারন হিন্দুদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। মধ্য যুগের মঙ্গল কাব্যের দিক বন্দনায় কবিরা বিভিন্ন দেব-দেবী ও পীরের সঙ্গে ইসমাঈল গাজীর বন্দনাও করেছেন।[১৮] ধর্মযোদ্ধা পীর ইসমাঈল গাজী বাংলার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট অধিকার করে আছেন।

১৭. জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪, পার্ট-১, পৃ. ২১৭।
১৮. সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, পৃ. ১৯৫।

তৃতীয় অধ্যায়
মহিসন্তোষ মাদ্রাসা ও পাঠসূচি

বাংলাদেশের কোনো ভৌগোলিক বিভাজনে মাদ্রাসা বা মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা পেশ করতে হলে সামগ্রিক বাংলায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ধারা (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন, মোঃ আবদুল করিম, সুলতানী আমলে বাংলাদেশের মাদ্‌রাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ, ইফাবা, ২০০২, মার্চ) ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমাদের কিছু ধারণা অবশ্যই থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো ঃ

ইসলাম সত্যিকারভাবে মানব জীবনে অগ্রগতির ধর্ম। ইসলাম শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে যেরূপ জোর তাগিদ দিয়েছে, বোধকরি আর কোনো ধর্মে এরূপ তাগিদ দেয়া হয় নি। মানুষের দেহ ও মন উভয়ের উন্নতি, আধ্যাত্মিক ও পার্থিব অগ্রগতি এবং বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশের উপরও ইসলাম জোর তাগিদ দিয়েছে। মহানবী (সা) প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্যে এলম বা জ্ঞানার্জন করা, অন্য কথায় বিদ্যা শিক্ষা করা ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ করেছেন "ত্বলাবুল এল্‌মু ফরিদাতুন আলাকুল্লী মুছলীমুন ওয়া মুছলী মাতুন"। তিনি আরো বলেছেন, "জ্ঞান অন্বেষণ কর, যদি সেজন্যে এমন কি চীনেও যেতে হয়।" "মাতৃকোড় থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর।" তিনি বিদ্যা শিক্ষার প্রতি এতো গুরুত্ব দিতেন যে, বদরের যুদ্ধের পরে শিক্ষিত বন্দীদের মুক্তিপণ হিসাবে মদিনার ছেলেদের শিক্ষা দেয়ার জন্যে নির্দেশ করেন। যে সকল বন্দী লেখাপড়া জানত মহানবী (সা) তাদেরকে বলে দিলেন "তোমরা প্রত্যেকে মদিনার দশজন বালককে লেখাপড়া শিখিয়ে দাও এটাই তোমাদের মুক্তিপণ।"[১] মুসলিম জাতি মহানবী (সা)-এর এই মহান শিক্ষা অনুসরণ করে চলেছেন। মুসলমানদের গৌরবদীপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ ও ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির অভূতপূর্ব উন্নতি-এই সত্যের উজ্জ্বল প্রমাণ।

মুসলিম শাসকগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ জয় করেছেন এবং বিজিত অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের প্রতি কঠোর মনোযোগ দিয়েছেন। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী সম্পর্কে সমসাময়িক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মীনহাজ-ই-সিরাজ বলেন, "যখন মুহম্মদ বখতিয়ার ঐ রাজ্য (বঙ্গ) অধিকার করেন (তখন তিনি) লখনৌতি নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন, সেই রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ অধিকার করেন এবং

---

১. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, **মোস্তফা-চরিত,** ৫ম প্রকাশ, কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ. ৪৩৩।

প্রত্যেক অঞ্চলে খুৎবা ও মুদ্রা প্রচলন করেন। এবং তাঁর ও তাঁর আমিরদের প্রচেষ্টা ও নির্দেশে ঐ অঞ্চলসমূহে (অসংখ্য) মসজিদ, মাদ্রাসা এবং উপাসনালয় দ্রুত ও সুন্দরভাবে নির্মিত হয়।[২]" মীনহাজ-ই-সিরাজ সুলতান গিয়াস উদ্দীন ইউওয়াজ খলজী সম্পর্কেও বলেন, "তাঁর দৌলতে সে রাজ্যের (বঙ্গের) যে বহু কল্যাণ সাধিত হয়েছিল তার নিদর্শন বিদ্যমান আছে। তিনি বহু এবাদতখানা ও মসজিদ নির্মাণ করেন। ওলামা, শেখ ও সৈয়দদের মধ্যে যারা বিশিষ্ট তিনি তাঁদেরকে ভাতা প্রদান করতেন। অন্যান্য প্রকারের লোকেরা তার বদান্যতার দৌলতে ধন-সম্পত্তির অধিকারী হতেন।"[৩]

বখতিয়ার খলজী শুধু একজন সৈনিক ছিলেন না, তিনি একজন সফল রাষ্ট্রনায়কও ছিলেন। তাঁর নওদীয়াহ বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার অধিবাসীরা প্রায় সকলেই অমুসলিম ছিল; তাদের তুলনায় বিজয়ী মুসলমানগণ সংখ্যায় অতি অল্প ছিলেন। তাই তিনি বুঝতে পারেন, এদেশে মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে অমুসলিম অধ্যুষিত এদেশে মুসলমান শাসন স্থায়ী করা অসম্ভব না হলেও দুরূহ হবে। তাই তিনি এদেশে মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোযোগ দেন। মুসলমানদের নামায আদায় করার জন্যে চাই মসজিদ, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্যে চাই মাদ্রাসা এবং ওলামা-সূফীদের জন্যে চাই খান্‌কা। সুতরাং তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা ও খান্‌কা নির্মাণ করেন। শুধু রাজধানীতেই যে এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি নির্মাণ করা হয়েছিল তা নয়, বরং বিজিত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠানগুলো নির্মিত হয়েছিল। তারীখ-ই-ফিরিস্তা সূত্রে জানা যায়, বাংলার (তৎকালীন) সীমান্ত অঞ্চল সুদূর রঙ্গপুর (রংপুর) শহরেও মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা নির্মিত হয়েছিল।[৪] মীনহাজ-ই-সিরাজ সুলতান গিয়াস উদ্দীন ইউওয়াজ খলজী কর্তৃক মসজিদ নির্মাণের কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি মাদ্রাসা ও খান্‌কা নির্মাণের কথা স্পষ্ট করে বলেন নি। তবে বলা হয়েছে, ওলামা, শেখ ও সৈয়দদের বেতন, বৃত্তি ও ভাতা দেয়া হয়েছে। ওলামা, শেখ সৈয়দদেরকে আহল-ই-খাইর বলা হয়েছে। এঁদেরকে আহল-ই-কলমও বলা হয়েছে। অন্যদিকে মুসলমান শাসনবর্গকে আহল ই-তেগ বা আহল-ই-দৌলত বলা হয়েছে।[৫] আহল-ই-খাইর বা আহল-ই-কলমের জীবিকা নির্বাহের জন্যে মুসলমান শাসকগণ বরাবরই ভূ-সম্পত্তি, বেতন, বৃত্তি বা ভাতা প্রদান করতেন। বাংলার সুলতানী আমলে (১২০৫-১৫৭৬খ্রিঃ) এগুলিকে 'ইনাম' 'মিল্ক' এবং 'মদদ-ই মাআশ' বলা হতো। মুঘল আমলে (১৫৭৬-১৫৫৭ খ্রিঃ) এগুলিকে 'সয়ূরগাল' বলা হতো। সুলতানী আমলে

২. তবকাত-ই-নাসিরী, পৃ. ২৯।
৩. প্রাগুক্ত পৃ. ৫৬।
৪. ফিরিস্তা (আবুল কাশেম), তারীখ-ই-ফিরিস্তা, লাহোর, ১৯০৫, পৃ. ২৯৩।
৫. আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ২২৪।

সদর-উস-সূদুর এবং শেখ-উল-ইসলাম পদবীধারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ এগুলোর তদারক করতেন। যে সকল ওলামা মাদ্রাসা বা মসজিদ চালাতেন তাঁদেরকে বিশেষ করে এসব সুযোগ সুবিধা দেয়া হতো।[৬]

এদেশে মুসলিম শাসনামলে (১২০৫-১৭৫৭ খ্রিঃ) বাংলার মুসলমানগণ শিক্ষাকে খুব গুরুত্ব দিতেন, কেননা শিক্ষাকে তাঁরা ধর্মীয় কর্তব্যের একটি অংশ, একটি অনুধ্যান এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার ও পারলৌকিক মুক্তি লাভের পন্থা হিসাবে গণ্য করতেন। দ্বিতীয়ত শিক্ষকদের প্রতি তাঁরা বিরাট সামাজিক সম্মান দান করতেন, কেননা একজন শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজে পরিবারের সম্মান বৃদ্ধি করেন। এ জগতে উন্নতির সোপান হলো শিক্ষা। বাংলায় মুসলিম শাসনামলে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা ছিল। সে যুগে প্রত্যেক মুসলমান যুবকেরই চাকুরী পাবার আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং তা কেবল শিক্ষাগত যোগ্যতার দ্বারাই সম্ভব হতো। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, ঐ যুগের বাঙ্গালী মুসলমানগণ তুলনামূলকভাবে অধিক ধনী ও সম্পদশালী ছিলেন। ফলে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাও সেই তুলনায় বেশি ছিল। এসব কারণে বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।

বাংলায় মুসলিম শাসনামলে (১২০৫-১৭৫৭ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলো ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। কিন্তু সেসব মাদ্রাসা এখন আর টিকে নেই। কালের কুটিল চক্রে সেসব মাদ্রাসা ধ্বংস হয়ে গেছে। বাংলার বৈরী আবহাওয়া এগুলো ধ্বংস হওয়ার অন্যতম কারণ। তবে সৌভাগ্যক্রমে কিছু শিলালিপি (Inscription) আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এবং কিছু লিখিত প্রমাণের সূত্রে আমরা কয়েকটি মাদ্রাসার অস্তিত্বের কথা জানতে পারি। প্রথমে, লিখিত প্রমাণের কথা বলা যাক ঃ লিখিত প্রমাণ সূত্রে মুসলিম শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত যেসব মাদ্রাসার কথা জানা যায় সেগুলির মধ্যে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত মহিসুন (মহিসন্তোষ) মাদ্রাসা, ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত সোনারগাঁ মাদ্রাসা, পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হযরত পান্ডুয়া মাদ্রাসা এবং ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে প্রতিষ্ঠিত বাঘা মাদ্রাসা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৭] শিলালিপি (Inscription) সূত্রে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত যে সব মাদ্রাসার সন্ধান মিলেছে সেগুলো হলো ঃ সুলতান রুকন উদ্দীন কায়কাউসের শাসনামলে (১২৯১-১৩০১ খ্রিঃ) হিজরী ৬৯৭ তে (১২৯৮ খ্রিঃ) পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার ত্রিবেনীতে নির্মিত একটি মাদ্রাসা, সুলতান শাম্স উদ্দীন ফিরোজ শাহের শাসনামলে (১৩০১-১৩২২ খ্রিঃ) হিজরী ৭১৩ তে (১৩১৩ খ্রিঃ) হুগলী জেলার ঐ একই স্থানে

৬. আই. এইচ. কুরেশী, **এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব দি সুলতানাত অব দেহলি**, ৪র্থ সংস্করণ, করাচী, ১৯৫৮, পৃ. ১৭৬, ১৯০।

৭. মো ঃ আব্দুল করিম (আমার), **সুলতানী আমলে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ**, ইকাবা, ২০০২, পৃ. ১৭-২৩।

নির্মিত আর একটি মাদ্রাসা, সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের (গনেশ পুত্র) শাসনামলে (১৪১৫-১৪৩২ খ্রিঃ) হিজরী ৮৩৫ এ (১৪৩২ খ্রিঃ) নির্মিত সুলতানগঞ্জ (রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে) মাদ্রাসা এবং সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের শাসনামলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) হিজরী ৯০৭ তে (১৫০১ খ্রিঃ) নির্মিত গৌড়ের শহরতলীতে (ঘোষপুর মৌজা) দরসবাড়ী মাদ্রাসা এবং হিজরী ৯০৯ তে (১৫০৩ খ্রিঃ) প্রায় একই স্থানে নির্মিত আর একটি মাদ্রাসা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৮] প্রাসঙ্গিক কারণে এখানে মহিসন্তোষ মাদ্রাসা ও তার অনুসৃত পাঠ্যসূচী সম্পর্কে একটি আলোচনা পেশ করা হলো ঃ

মহিসন্তোষ মাদ্রাসা ঃ আমরা উপরে দেখেছি, বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামলের প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেসবের মধ্যে মহিসুন (মহিসন্তোষ) মাদ্রাসা প্রাচীনতম। এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাওলানা তাকী উদ্দীন আল-আরাবী এবং তিনি আজীবন এই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। বাংলাদেশে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তলিয়ে দেখলে বলা যায়, মাওলানা তাকী উদ্দীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহিসন্তোষ মাদ্রাসা শুধু গুণগত দিক থেকেই প্রথম শ্রেণীর নয় বরং প্রতিষ্ঠার দিক দিয়েও মুরব্বী ছিল।

হাক্কানী আলেম ও আধ্যাত্মিক সাধক তাকী উদ্দীন আল-আরাবী খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে মহিসুনে (মহিসন্তোষ) এসে ইলমে দ্বীন প্রচার করেন এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সেখানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৯] পরবর্তীতে সেই মাদ্রাসা মুসলিম শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। মহিসুনে মাওলানা তাকী উদ্দীন আলা-আরাবীর পাণ্ডিত্য ও খ্যাতি অল্পদিনের মধ্যেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর সুনাম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করে। বিহারের মানের শরীফের বিখ্যাত সূফী মখদুম শায়খ শরফ উদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরীর পিতা শায়খ ইয়াহিয়া মানেরী মাওলানা তাকী উদ্দীন আল-আরাবীর নিকট মহিসুন শিক্ষা কেন্দ্রে জ্ঞানার্জন করেন। ইয়াহিয়া মানেরীর ইল্‌মে দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় এবং মারিফাততত্ত্বে মহিসুনে পারদর্শিকতা অর্জন করেন। উভয় বিষয়ে মাওলানা তাকী উদ্দীন আল-আরাবী ইয়াহিয়া মানেরী উস্তাদ ও মুর্শীদ ছিলেন। আরো জানা যায়, শায়খ ইয়াহিয়া মানেরী ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এসব তথ্য মখদুম শায়খ শরফ উদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরীর জ্ঞাতিভ্রাতা শাহ শুয়াইব কর্তৃক রচিত "মানাকিব আল-আসফিয়া" সূত্রে জানা যায়।[১০] এতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে মহিসুন উচ্চ-শিক্ষার একটি

---

৮. শিলালিপির জন্য দ্রষ্টব্য ঃ শামসুদ্দীন আহমেদ, **ইনসক্রিপশনস অব বেঙ্গল,** ভল্যুম-৪, রাজশাহী, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, ১৯৬০।

৯. এম. এ. রহিম, **বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,** ১ম খন্ড. পৃ. ২০৫।

১০. শাহ শুয়াইব, **মানাকিব-আল-আসফিয়া** (সার সংক্ষেপ মকতুবাত-ই-সাদী-এর পরিশিষ্টে প্রকাশিত), পৃ. ৩৩৯।

কেন্দ্র ছিল। এই শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় অত্র অঞ্চলসহ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের পরিধি প্রসারিত হয়েছিল। এবং অত্র অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ইসলামের সার্বিক বিধানের সাথে পরিচিতি লাভের সুযোগ পেয়েছিল।

হক্কানী আলেম ও আধ্যাত্মিক সাধক মাওলানা তাকী উদ্দীন আল-আরাবী সম্ভবত আরবদেশে থেকে এসেছিলেন বলে তাঁর নামের শেষে আল-আরাবী যুক্ত হয়েছে। তবে তাঁর জন্ম, বাল্যজীবন, শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি কখন, কিভাবে মহিসুনে (মহিসন্তোষ) আসেন তাও উদ্ধার করা যায় নি। কথিত আছে, তিনি উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে তৎকালীন বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়ায় কিছুদিন অবস্থান করেন। অতঃপর সেখান থেকে মহিসুনে এসে আস্তানা গাড়েন এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সাধক মাওলানা তাকী উদ্দীন সম্ভবত সোহরাওয়ার্দী তরীকার অনুসারী ছিলেন। এই তরীকার আরো সূফী-সাধক মহিসুনে শায়িত আছেন যা জৌনপুরের বিখ্যাত দরবেশ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর চিঠি (মুকতুবাদ) থেকে জানা যায়।[১১] তাকী উদ্দীন আল-আরাবী আজীবন মহিসন্তোষ মাদ্রাসায় দ্বীনের আলো বিতরণ করে সেখানেই শায়িত আছেন।[১২] মহিসন্তোষে চিরনিদ্রায় শায়িত সেই সূফী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ত্রয়োদশ শতকে মহিসন্তোষসহ সমগ্র বরেন্দ্র অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসার হয়েছিল। মাওলানা তাকী উদ্দীন আল-আরাবীর স্মরণে সেখানে প্রতি বছর দূর-দূরান্ত থেকে অগণিত নারী-পুরুষ আগমন করেন এবং এই সূফীর প্রতি তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করেন।

মাদ্রাসায় অনুসৃত পাঠ্যসূচি ঃ ইসলামিক জ্ঞানার্জনে মক্তব, মসজিদ এবং মাদ্রাসার গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলমান শিশুরা মক্তব ও মসজিদে তাদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করে। প্রত্যেক মসজিদ সংলগ্ন স্থানে সাধরণত মক্তব পরিচালিত হয়ে থাকে। আবার কখনো এইসব মক্তব অবস্থা-সম্পন্ন লোকের বাড়ীতে তাঁদের অর্থে পরিচালিত হয়। শরীয়তের অনুশাসনে সাত বছর থেকে একজন মুসলমান বালক-বালিকার উপর নামায এবং ইসলামের অন্যান্য রুকন পালন ফরয হয়। ইসলামের এইসব কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে একজন শিশুর অন্তত দুবছর সময় প্রয়োজন। কাজেই এটি ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে, একজন শিশুকে পাঁচ বছর বয়সের সময় মক্তব কিংবা মসজিদে প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করতে হয়, যাতে সে দু'বছর সময়ের মধ্যে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও প্রারম্ভিক দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারে। মুসলিম সমাজে চার বছর, চার মাস, চার দিনে একজন বালক বা বালিকার 'বিসমিল্লাহ্ খানি' অনুষ্ঠান করে শিক্ষা আরম্ভ করার রীতি প্রচলিত আছে। মোটকথা চার-পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে একজন শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার

---

১১. আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর পত্রের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৮।
১২. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, **রাজশাহীতে ইসলাম**, ঢাকা. ইফাবা, ১৯৯২, পৃ. ৪৫।

জন্যে মক্তব অথবা মসজিদে হাজির হতে হবে। তবে বিশেষ কারণে এই বয়সসী পাঁচ থেকে সাত বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে।

মুসলিম শিশুদের জন্যে মক্তব ও মসজিদে প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হবে ধর্ম শিক্ষা দিয়ে। মসজিদের ইমাম শিক্ষক হিসাবে শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামের মৌলি অনুশাসন এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞান দান করবেন। বাংলার মুসলি শাসনামলে সমকালীন সাহিত্যে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখি হয়েছে, মৌলবীগণ মক্তবে মুসলমান শিশুদের অযু ও নামায সম্পর্কে শি দিতেন।[১৩] ইসলামের মৌলিক অনুশাসন এবং অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে অবগত হতে হ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান হাসিল করা অপরিহার্য। সমসাময়িক সাহিত্য সূ জানা যায়, সাইয়েদ, কাযী এবং সমাজপতিগণ কুরআন ও হাদীসের অনুশাস অনুযায়ী মুসলিম সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দান করতেন।[১৪]" কাজে নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলার অন্যান্য মাদ্রাসার ন্যায় মহিসন্তোষ মাদ্রাসায় প্রাথমি পর্যায়ে শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে কুরআন ও হাদীসের পঠন-পাঠন অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইসলামে অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে হলে ফিক্‌হ শাস্ত্রে অভিজ্ঞান পূর্ব শর্ত হিসাবে গণ্য করা হয়। কুরআন ও হাদীসকে মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করে মুজতাহিদ বা আইন বিশেষজ্ঞগণ যাবতীয় সমস্যার সমাধান দান করে ে ব্যবহারিক শাস্ত্রের সূত্রপাত করেছেন তাকে ফিকহ্ শাস্ত্র হিসাবে অবিহিত করা হয় সাধারণ লোকের পক্ষে কুরআন ও হাদীসে এমন গভীর অভিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হ না যা দিয়ে প্রতিটি সমস্যার শরীয়তসম্মত সমাধান করে অনুশাসন পালন করতে পারে। এজন্যে ফিকহ্ বা ব্যবহারিক শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। তাহলে বল যায়, মহিসন্তোষ মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে কুরআন, হাদীস ও ফিকহ্ বা ব্যবহারিক শাস্ত্রের পঠন-পাঠন অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই তিনটি বিষয়ের সাথে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাথীদের ভাষা হিসাবে আরবী, ফারসী ও বাংলা শিখানো হতো। কুরআনের ভাষা হিসাবে ছাত্রদের জন্যে আরবী ভাষা শিক্ষা করা অবশ্যক বলে গণ্য হতো। বাংলার সুলতানী আমলে উৎকীর্ণ আরবী শিলালিপি এই মতকে সমর্থন করে। রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে অনুরূপভাবে ফারসী ভাষা শিক্ষা দেয়া হতো। সরকারী চাকুরী লাভের জন্যে ফারসী ভাষা শিক্ষা আবশ্যক ছিল। উপরন্তু ফারসী ভাষায় ধর্মীয় গ্রন্থাদি রচিত হতো। কাজেই এসব গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্যে ফারসী ভাষা শিখতে হতো। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতকে বাংলার সুলতানদের দরবারে আগত চৈনিক রাজদূতদের বর্ণনায় জানা যায়, শাসক, অমাত্য

---

১৩. মুকুন্দ রাম, কবি কঙ্কন চন্ডী (শ্রী কুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাঃ), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২, পৃ. ৩৪৫।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩।

অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা ফারসী ও বাংলা ভাষায় সমভাবে পারদর্শী ছিলেন।[১৫] সব তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে কুরআন, হাদীস ও ফিকহ্শাস্ত্র আবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে এবং আরবী, ফারসী ও বাংলা ভাষা হিসাবে ছাত্রদের পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল।

এই প্রাথমিক শিক্ষার পর আসে প্রাগ্রসর শিক্ষা। মহিসন্তোষ মাদ্রাসা মুসলিম বাংলার প্রথম শ্রেণীর মাদ্রাসাভুক্ত হওয়ায় সেখানে শিক্ষার্থীদের জন্যে প্রাগ্রসর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।[১৬] প্রাথমিক শিক্ষার মূল বিষয় আরো ব্যাপক ও বিশ্লেষণধর্মী করে প্রাগ্রসর ছাত্রদের নিকট উপস্থাপন করা হতো। কাজেই বলা যায়, কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা প্রাগ্রসর শিক্ষার পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল। কুরআনের তাফসীর ও হাদীসের তাশরীহ এই পর্যায়ভুক্ত ছিল। বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় ও সমস্যার উপর কুরআন ও হাদীস থেকে সিদ্ধান্ত ও যুক্তি দিয়ে পেশ করতে ইজতিহাদ এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। মহানবী (সা) মুয়ায বিন জাবালকে ইয়ামেনের শাসনকর্তা হিসাবে প্রেরনের সময় কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট নির্দেশ মিলেনা এমন বিষয়ের উপর কুরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইজতিহাদের মাধ্যমে মত পেশ করার অভিপ্রায়কে প্রশংসা করেছিলেন।[১৭] এই ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে সুন্নি মুসলমানদের চারটি অনুমোদিত মযহাব (আইন বিন্যাসের পদ্ধতি ও পথ) গড়ে উঠেছে। কাজেই প্রাগ্রসর শিক্ষার প্রধান বিষয় হিসাবে মহিসুন মাদ্রাসায় ফিকহ্শাস্ত্র পঠন ও অনুশীলনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এইসব বিষয় ছাড়াও তর্কবিদ্যা, গণিত, চিকিৎসা বিজ্ঞান, আল-কেমী বা রসায়ন, হিনদাসা বা জ্যামিতি, জ্যোতিষশাস্ত্র, তারীখ বা ইতিহাস এবং আরো অনুরূপ বিষয় শিক্ষার পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল। মহিসন্তোষ মাদ্রাসা বাংলার প্রথম শ্রেণীর মাদ্রাসাভুক্ত হওয়ায় এইসব বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল।[১৮] এই সম্পর্কে সম্রাট আকবরের দরবারি ঐতিহাসিক আবুল ফজলের বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "প্রত্যেক বালককে নৈতিকতা, গণিত, কৃষি, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, পরিমাপ-কৌশল, মনস্তত্ত্ব গার্হস্থ্য, প্রশাসন, চিকিৎসা, যুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে জ্ঞান অর্জন করতে হতো।[১৯]" এ থেকে অনুমিত হয়, প্রথম শ্রেণীর মাদ্রাসা ও উচ্চতর শিক্ষায়তনে এসব বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা থাকতো। তবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী সকল বিষয় শিক্ষা লাভ করা বা পারদর্শিতা অর্জনের জন্যে বাধ্য ছিল না। অর্থাৎ নিজের

---

১৫. পি. সি. বাগচি, **"পলিটিক্যাল রিলেশন বিটুইন বেঙ্গল এন্ড চীন ইন দি পাঠান পিরিয়ড,"** বিশ্ব ভারতী **এ্যানালস**, ভল্যুম-১, কলকাতা, ১৯৪৫, পৃ. ১২৪।

১৬. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, **রাজশাহীতে ইসলাম**, পৃ. ৫৪।

১৭. **তিরমিযী আল জামি**, করাচী, নূর মুহম্মদ লাইব্রেরী, পৃ. ২১১; মিশকাত-আল-মাসাবীহ, করাচী, নূর মুহম্মদ লাইব্রেরী, পৃ. ৩২৪।

১৮. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, **রাজশাহীতে ইসলাম**, পৃ. ৫৫।

পছন্দ অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন পূর্বক প্রাগ্রসর শিক্ষার্থীরা এক বা একাধিক বিষয়ে অধ্যয়ন করে দক্ষতা অর্জন করার সুযোগ লাভ করত।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাখা শবব্যবচ্ছেদ ও শরীর-কাঠামোবিদ্যা প্রথম শ্রেণীর মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল বলে ধারণা করা যায়। একটি শিলালিপিতে সুলতান জালাল উদ্দীন ফতেহ্ শাহকে (১৪৮১-১৪৮৬ খ্রিঃ) কুরআনের রহস্যের ভেদ উন্মোচনকারী এবং ধর্ম ও শরীর তত্ত্বের অভিজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে[১৯]। উক্ত সুলতান সম্পর্কে এই গুণাবলীর প্রয়োগ নির্দেশ করে যে, বাংলার উচ্চতর শিক্ষায়তনে বা প্রথম শ্রেণীর মাদ্রাসায় তাফসীর, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব এবং শরীর বিজ্ঞান পাঠসূচিভূক্ত ছিল। এছাড়া তীর চালনা ও যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা উচ্চতর শিক্ষায়তনে পাঠসূচীভুক্ত ছিল।[২০] তবে এটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে প্রাগ্রসর শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করতো। মুহম্মদ বুদাই কর্তৃক লিখিত 'হিদায়াত আর-রামী' বা তীর চালনার নির্দেশিকা প্রমাণ করে যে, তীর চালনা বিদ্যা এই মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল।[২১] মসজিদ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য স্থাপত্য ইমারতের শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ লিপির[২২] সাক্ষ্যে বলা যায়, ক্যালিগ্রাফি বা লিপিকলা একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে প্রাগ্রসর মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে মহিসন্তোষ মাদ্রাসায় পঠিতব্য বিষয়ের প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয়, আরবী ও ফারসী ভাষার উপর পূর্ণ দখল অর্জন করতে না পারলে উপরোক্ত বিষয়ে গভীরে প্রবেশ করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। সে কারণে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষার উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

উচ্চতর শিক্ষার মাদ্রাসাগুলো বাংলার মুসলিম শাসকদের আর্থিক অনুদান এবং প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হতো। শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিসূত্রে বলা যায়, মুসলিম শাসকগণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্যে আর্থিক অনুদান বরাদ্দ করে উচ্চতর শিক্ষার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছেন।[২৩] অনুরূপভাবে, মহিসন্তোষ মাদ্রাসা, মসজিদ এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ২৭৫০ বিঘা লাখারাজ ভূমি অনুদান হিসাবে মুসলিম শাসনামল থেকে চলে আসছিল, এমন কি তা উনবিংশ শতক পর্যন্ত চালু ছিল। এদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে তা ক্রমে ক্রমে রদ হয়ে যায়।[২৪] মহিসন্তোষ দরগার বর্তমান খাদিমদার তদারককারীর (পদবি চেরাগী) বর্ণনায় জানা যায়, ঐ বিশাল ভূ-সম্পত্তির সামান্যতম অংশ তিনি খাদিমদার সূত্রে এখনো

---

১৯. আবুল ফজল, **আইন-ই-আকবরী** (ব্লকম্যান অনুঃ), ভল্যুম-১, পৃ. ১১০।
২০. আবিদ আলী. **মোমেইরস**, পৃ. ৮৭; ইসলামিক স্টাডিস, ভল্যুম-২৫, পৃ. ৪৩৩।
২১. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, **রাজশাহীতে ইসলাম**, পৃ. ৫৫।
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
২৩. ইসলামিক স্টাডিস, ভল্যুম-২৫, পৃ. ৪৩৪-৪৩৫।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪, ৪৪৩, পাদটীকা-৭১ দ্রষ্টব্য ঃ

ভোগদখল করে যাচ্ছেন।[২৫] ঐ সূত্রে বলা যায়, এদেশে মুসলিম শাসনামলে মহিসন্তোষ মাদ্রাসা উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে পূর্ণ সরকারী অনুদানে পরিচালিত হয়েছে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যাবতীয় খরচ মুসলিম শাসকগণ বহন করেছেন।

একটি হাদীসে জানা যায়, "যদি কোনো লোক মারা যায় তখন তাঁর সকল আমল বন্ধ হয়ে যায় তবে তিনটি কর্মফল চালু থাকে। ১ম, সদকায়ে জারিয়া; ২য়. যেই ইল্‌ম বা শিক্ষা থেকে মানুষের উপকার হয়; ৩য়, সৎ সন্তান যে তাঁর জন্যে দোয়া করে।"

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে শিক্ষাদান কাজ বা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাকে অত্যন্ত পুণ্যের কাজ বলে সকল মুসলমান মনে করে থাকেন। পূর্বে যেমন শিক্ষাকে ধর্মীয় কর্তব্য মনে করা হতো, এখনো তাই মনে করা হয়। পূর্বে যেমন ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ শিক্ষার জন্যে ব্যয় করতেন এখনো তাই করেন। তবে যুগের পরিবর্তনের ফলে এর প্রয়োগেরও অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। আলেমদের আগের মর্যাদা বা সম্মান এখন আর তেমন নেই। এর প্রধান কারণ রাষ্ট্রীয় নীতির পরিবর্তন। পূর্বকালে সুলতানেরা শাসন কাজকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন; সালতানাতকে ইসলামী রাষ্ট্ররূপে রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হতো। ফলে রাষ্ট্রীয় কাজেও শেখ, সৈয়দ, আলেমদের প্রয়োজন ছিল অত্যধিক। কাজী, সদর, সদর-উস-সুদুর, শেখ-উল-ইসলাম পদ এখন আর নেই। সুতরাং আলেমদের উচ্চ মর্যাদার এই পদটি একেবারেই বন্ধ। যেহেতু রাষ্ট্র ইসলামী নয়, তাই ইসলামী আইনের ব্যাখ্যার জন্যে আলেমদের আর ডাকও পড়ে না। ইংরেজ শাসনের সময় থেকে এদেশের আলেম সমাজ অর্থনৈতিক দিক দিয়েও পর্যুদস্ত।

দ্বিতীয়ত, মুসলমান শাসনামলে আলেমদের নিজ নিজ কাজে, শিক্ষাদানে বা গবেষণায় প্রচুর স্বাধীনতা ছিল। ইনাম, মিল্ক এবং মদদ-ই-মাশ তাঁদের যেমন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দান করতো, শিক্ষাদান কাজেও তাঁদের স্বাধীনতা দান করতো। ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকরাই ছিলেন প্রধানতম বিচারক। শিক্ষক ছাত্রদের শিক্ষাগত মানে সন্তুষ্ট হলেই তিনি ছাত্রদের সার্টিফিকেট বা দস্তার বা ইজাজত দিতেন। কোনো রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা বা কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা ছিল না। শিক্ষার্থীরা জানত যে, শিক্ষকরাই তাদের মান যাচাই করার একমাত্র কর্তা; পরীক্ষায় পাশের জন্যে বাছাই করে পড়ার বা নকল করার বা অন্য কথায় ফাঁকি দেয়ার কোনো অবকাশ ছিল না। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও সত্য যে, আমাদের সেই পদ্ধতি জাপানে উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত।

২৫. মহিসন্তোষ দরগার খাদিমদারের বংশতালিকা (বর্তমান খাদিমদারের বর্ণনামতে) ঃ ১. মো ঃ হাডু (ঝাডু) ফকির (মৃত), ২. মো ঃ নিলবর আলী দেওয়ান (মৃত), ৩. মো ঃ জসিম উদ্দীন দেওয়ান (মৃত), ৪. মো ঃ রমজান আলী দেওয়ান (বর্তমান খাদিমদার, গ্রাম-চককালু, পো ঃ বীরগ্রাম, থানা-ধামইরহাট, জেলা-নওগাঁ)।

সেকাল আর একাল, সময় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার অনেক সংস্কার হয়েছে। অবস্থা এমন পর্যায় এসে পড়েছে যে, আধুনিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যকার পার্থক্য দিন দিন কমে আসছে। মাদ্রাসা শিক্ষার আরো সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এমন কিছু মাদ্রাসা কি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন নয়, যেখানে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া হবে এবং কুরআনের গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে শিক্ষকরা মতামতের দিক দিয়ে থাকবেন সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং আর্থিকভাবে থাকবেন ভাবনাহীন, যেখানে সরকারী নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি থাকবে না, কিন্তু সেখান থেকে বের হবেন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহা-পন্ডিত। এমনিতেই আমাদের দেশে শিক্ষার মান অনেক নীচু হয়ে গেছে, দিনে দিনে আরো নীচু হওয়ার আশংকা দেখা দিচ্ছে, ইতোমধ্যেই আরবী, ফারসী এবং উর্দু শিক্ষার প্রতি উৎসাহ হারিয়ে গেছে। প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায়, ভাল মুহাদ্দিস্ বা মুফাস্‌সির-এর অভাব দেখা দিয়েছে। তবে এটাও সত্য যে, দুনিয়ালোভী আলেম বা শিক্ষকগণ ব্যতিক্রমধর্মী কার্যকলাপের জন্যে নিন্দা ও ধিক্কার লাভ করে আসছে। এসব ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের কাছেও মর্যাদাবান নন। সুতরাং বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

চতুর্থ অধ্যায়
মহিসন্তোষ মসজিদ ও শিলালিপি

ইসলাম প্রচার ও মুসলিম সমাজ গঠনে মসজিদ-মাদ্রাসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মসজিদ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী হয়। শুধু তাই নয় মানব কল্যাণমূলক যাবতীয় চিন্তা কর্ম এখান থেকে সম্প্রসারিত হয়। মদীনায় হিজরত করার পর মহানবী (সা)-এর প্রথম কাজ ছিল মসজিদ নির্মাণ। এই মসজিদে নামায আদায় করা ছাড়াও শিক্ষা থেকে শুরু করে একটি মুসলিম সমাজ গঠনের জন্যে যা যা প্রয়োজন তা মহানবী (সা) আনজাম দিয়েছেন। বিশেষ করে দরস্ ও তাদরীসের কাজ সবসময় মসজিদে অব্যাহত ছিল। মহানবী (সা) মদিনার মসজিদে নামায আদায়, ইল্‌মের চর্চা এবং গভীরভাবে ইবাদত ও প্রশিক্ষণের জন্যে সুফ্‌ফার (পরবর্তীকালে খানকার প্রাথমিক রূপ) ব্যবস্থাসহ মসজিদের ব্যাপক কার্যক্রমের একটি অবকাঠামো সর্বযুগের জন্যে নিরূপণ করে দিয়েছেন। তাই বিজয়ী বেশে মুসলমানরা যে যে দেশে বা অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন সেখানেই তাঁরা মহানবী (সা)-এর অনুকরণে প্রথমে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। বাংলাদেশে-এর ব্যতিক্রম হয় নি।

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী লখনৌতি রাজ্য জয় করে রাজধানী শহরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিশেষত প্রশাসনিক বিভাজন সমূহে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা নির্মাণ করেন।[১] তাঁর পরবর্তী সুলতানগণও এই নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে বাংলার বিভিন্নস্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা নির্মাণ করেন। মূলত সারা মুসলিম শাসনামলে এদেশে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি নির্মিত হয়েছে। আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখেছি, বখতিয়ার খলজীর বিজয় থেকেই আলোচ্য মহিসন্তোষ একটি প্রশাসন কেন্দ্রে উন্নীত হয় এবং সেখানে যথারীতি মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা নির্মিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেসব মসজিদ, মাদ্রাসা বা খানকা এখন আর টিকে নেই; কিন্তু সেসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে মহিসন্তোষে নির্মিত মসজিদ সম্পর্কে একটি আলোচনা পেশ করার প্রয়াস চালানো যায়।

---

১. তবকাত-ই-নাসিরী, পৃ. ২৯।

মহিসন্তোষ থেকে এযাবৎ চারটি মসজিদের শিলালিপি (যথাস্থানে আলোচনা পেশ করা হবে) উদ্ধার করা হয়েছে। সেসব মসজিদ এখন আর টিকে নেই, না থাকাটাই স্বাভাবিক। বাংলার ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্দ আবহাওয়া সেসব মসজিদ ধ্বংসের মূল কারণ। সম্ভবত সেসব মসজিদের নির্মাণ উপকরণ ছিল রৌদ্রস্নাত ইট অথবা পোড়া ইট যা প্রতিকুল আবহাওয়ায় দীর্ঘ যুগের ব্যবধানে এর অস্তিত্ব টিকে রাখতে পারে নি। তবে মহিসন্তোষে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটিমাত্র মসজিদের ভিত এখনো টিকে আছে। নিম্নে এই মসজিদ সম্পর্কে একটি আলোচনা পেশ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

পরিকল্পনা ও বিন্যাস ঃ[২] মসজিদটি এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে পশ্চিম দিকের টিকে থাকা মসজিদ প্রাচীরের অংশ বিশেষ এবং জুল্লাহ্ বা নামায কক্ষের অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি পাথর স্তম্ভ দেখে এর একটি সম্ভাব্য ভূমি নক্শা এবং নির্মাণ পরিকল্পনা তৈরী করা যায়। এই টিকে থাকা মসজিদ প্রাচীর এবং পাথর স্তম্ভের সূত্র ধরে বলা যায়, মসজিদ প্রাচীরের মূল কাঠামো পোড়া ইট দ্বারা নির্মিত ছিল এবং তার ভিতর ও বাহির উভয় অংশে সাইজ করা শিলাখন্ড বিশেষ সংযুক্তি প্রক্রিয়ায় সংস্থাপিত হয়েছিল। পরিকল্পনার দিক থেকে এটি একটি আয়তাকার মসজিদ যার পরিমাপ অভ্যন্তরীণ পরিসরে উত্তর থেকে দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ৬৬ ফুট এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রস্থে ৩৯ ফুট। তবে মসজিদ প্রাচীরের প্রশস্ততা পরিমাপ করে সম্পূর্ণ মসজিদের পরিমাপ দাঁড়ায় দৈর্ঘ্যে ৮০ ফুট এবং প্রস্থে ৫৩ ফুট। জুল্লাহ্ বা নামায কক্ষের অভ্যন্তরে অবস্থিত পাথর স্তম্ভের অবস্থান বিবেচনা করে বলা যায়, এই মসজিদ উত্তর থেকে দক্ষিণে তিন আইল বা লম্বমান তিন খিলান পথ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে পাঁচ 'ব্যে' বা হ্রস্বমান গলিপথে বিভক্ত ছিল। তাতে করে এর নামাযকক্ষে পনেরটি পরিসর ছিল যার ছাদ অর্ধ গোলাকৃতির পনেরটি ইটের গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। মসজিদের পূর্ব প্রাচীরে পাঁচটি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ ছিল; পশ্চিম প্রাচীরে অনুরূপভাবে পাঁচটি মিহরাব ছিল। এবং উত্তর ও দক্ষিণ প্রাচীরে তিনটি করে মোট ছয়টি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ ছিল। মোটকথা, পরিকল্পনার দিক থেকে একটি জামে মসজিদ হওয়ার সব বৈশিষ্ট্য এই মসজিদের নির্মাণ প্রক্রিয়ার ছিল। পাথরের উপর খোদাই করে বিভিন্ন অলংকরণ মটিফ মসজিদের অলংকরণ সাজসজ্জা বাড়িয়ে তুলেছিল।

এই মসজিদের নির্মাণ তারিখ সম্পর্কে এর ধ্বংসস্তুপে প্রাপ্ত দুটি শিলালিপি (সুলতান রুকন উদ্দীন বারবক শাহের শাসনামলের ১৪৫৯-'৭৪ খ্রি.) বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলা যায়, উলুঘ ইকরার খান তাঁর অধীনস্ত কর্মকর্তা আশরাফ খানের মাধ্যমে ১৪৬০/৬১ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং তিনি (ইকরার খান) ঐ স্থানের ওয়াজির (প্রশাসক) পদে বহাল থাকাবস্থায়ই

---

২. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, **রাজশাহীতে ইসলাম**, পৃ. ৮২-৮৩।

১৪৭১/৭২ খ্রিস্টাব্দে উক্ত মসজিদের নির্মাণ ও অলংকরণের যাবতীয় কাজ সমাপ্ত করেন। যা হোক, এই মসজিদটিকে পরবর্তী ইলিয়াস শাহী স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত। মসজিদটি গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদের অনুরূপ ছিল বলে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

মুসলিম বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনে শিলালিপির গুরুত্ব অপরিসীম। সমসাময়িক কালে লিখিত সূত্রে যেসব তথ্য পাওয়া যায় না, তা শিলালিপির সূত্রে উদ্ধার করা যায়; বিশেষ করে মধ্য যুগের বাংলার মুসলমান শাসকদের ইতিহাস পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে শিলালিপি মুখ্য উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। শিলালিপিতে এমন তথ্য উৎকীর্ণ হয়ে থাকে বা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর আলোকপাত করে অথবা শাসক সম্পর্কে এমন বিশেষণ উপস্থাপিত হয় যার মূল্যায়ন করে ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত ধারার সংযোজন-বিয়োজন কিংবা পুনর্গঠন সম্ভব হয়। বাংলার সুলতানী আমলের (১২০৫-১৫৭৬) ইতিহাস সম্পর্কে শিলালিপির সাক্ষ্যে আমরা অনেক মূল্যবান তথ্য অবগত হতে পারি। প্রাসঙ্গিক কারণে মহিসন্তোষ থেকে উদ্ধারকৃত চারটি শিলালিপি সম্পর্কে নিম্নে একটি আলোচনা পেশ করা হলো।

মহিসন্তোষ থেকে উদ্ধারকৃত চারটি শিলালিপিতেই মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সেসব শিলালিপির মধ্যে মি ঃ ওয়েস্ট ম্যাকট (দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেট) দুটির সন্ধান লাভ করেন। দুটি শিলালিপিই সুলতান রুকন উদ্দীন বারবক শাহের শাসনামলের (১৪৫৯-১৪৭৪)। এর মধ্যে প্রথম শিলালিপিতে (১৪৬০/৬১ খ্রিস্টাব্দের) উলুঘ ইকরার খানের অধিনস্থ কর্মকর্তা আশরাফ খান কর্তৃক একটি মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত (সম্ভবত নির্মাণ কাজের আরম্ভ ভিত্তিস্থাপন) তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। কারণ দ্বিতীয় শিলালিপিটিও (১৪৭১/৭২ খ্রিস্টব্দের) একই মসজিদ নির্মাণ (সম্ভবত কাজের সমাপ্তি পর্বের) সম্পর্কিত।[৩] মহিসন্তোষ থেকে উদ্ধারকৃত তৃতীয় শিলালিপিটি রাজশাহী বরেন্দ্র যাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা বাবু শরৎ কুমার রায় কর্তৃক মহিসন্তোষ মাযারে পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত মীঠাপুকুর নামক দীর্ঘির দক্ষিণ পাড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি মসজিদ থেকে আবিষ্কৃত হয়ে বরেন্দ্র যাদুঘরে রক্ষিত হয়েছে। এই শিলালিপিতে সুলতান আলা উদ্দীন হোসেন শাহের শাসনামলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) ৯ রমজান ৯১২ হিজরী মোতাবেক ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জনৈক সুহাইলের পুত্র কর্তৃক একটি মসজিদ নির্মাণের তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।[৪] মহিসন্তোষের চতুর্থ শিলালিপিটিও পূর্বোক্ত মীঠাপুকুরের দক্ষিণ পাড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের প্রত্নজঞ্জালের মধ্যে আবৃত ছিল। সেটি প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এরশাদ সরকারের শাসনামলে মহিসন্তোষে স্থাপিত গুচ্ছ গ্রামের লোকজন কর্তৃক উক্ত মসজিদের প্রত্নজঞ্জাল অপসারণকালে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে এবং একই স্থানে প্রাচীন ইট-

---

৩. **ইনসক্রিপশনস অব বেঙ্গল**, ভল্যুম-৪, পৃ. ৭৩-৭৫।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

কাদা দিয়ে গাঁথুনি করা মসজিদের প্রধান দরজার পাশে উন্মুক্ত অবস্থায় বহুদিন পড়ে থাকে। অতঃপর শিলালিপিটি হারিয়ে যাওয়ার আশাঙ্কায় সেটি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য জনাব নূর মোহাম্মদ, সাকিন চৌঘাট-এর জিম্মায় রাখা হয়। সম্প্রতি (০৮/১১/১৯৯৫ ইং) সেটি পাহাড়পুর যাদুঘরের সহকারী পরিচালক জনাব মাহবুব জামানের তত্ত্বাবধানে সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছে।[৫]

সুখময় মুখোপাধ্যায় মহিসন্তোষে প্রাপ্ত আর একটি শিলালিপির কথা বলেন। এই শিলালিপিতে জনৈক নসরত খানের নাম মিলে এবং এই শিলালিপিতে তাঁকে জোর ও বারোর-এর শিকদার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বারোর-এর আধুনিক নাম বারুর, বর্তমান ভারতের পুর্ণিয়া জেলাধীন।[৬]

প্রাসঙ্গিক কারণে মহিসন্তোষ থেকে উদ্ধারকৃত প্রথম শিলালিপিটি পাঠ সহ নিম্নে আলোচিত হলো। মসৃণ পাথরে দুই লাইনে এর লিপি উৎকীর্ণ হয়েছে।[৭]

قال النبى صلى الله عليه وسلم من بنى المسجد فى

الدنيا بنى الله سبعين قصرا فى الجنة – بنى المسجد فى

زمن الملك العادل السلطان ابن السلطان ركن الدنيا

والدين ابو المجاهد بار بكشاه السلطان ابن محمود شاه

السلطان– البانى خان المعظم الغ اقرار خان بواسطى

خان معظم اشرفخان– خمس ستين وثمانماية–

অনুবাদ ঃ মহানবী (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মসজিদ নির্মাণ করেন আল্লাহ্ বেহেশ্তে তাঁর জন্য সত্তরটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন।"

এই মসজিদ সুবিচারক শাসক সুলতানের পুত্র সুলতান রূকন উদ্দিন আবুল মুজাহিদ বারবক শাহ আস-সুলতান-বিন মাহমুদ শাহ আস-সুলতানের সময়কালে নির্মিত হয়। এই মসজিদের নির্মাণকারী হচ্ছেন সম্মানিত খান উলুঘ ইকরার খান। তিনি সম্মানিত খান আশরাফ খানের মাধ্যমে ৮৬৫ হিজরী/১৪৬০/৬১ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেন।

পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন ঃ আরবী নাস্খ শিখন পদ্ধতিতে লিপিটি উৎকীর্ণ হয়েছে। এই লিপির সাক্ষ্যে বলা যায়, মহিসন্তোষের অবলুপ্ত প্রায় মসজিদটি পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান রুকন উদ্দীন বারবক শাহের শাসনামলে নির্মিত

৫. লেখকের ব্যক্তিগত পরিদর্শন ও সাক্ষাৎকার।

৬. সুখময় মুখোপাধ্যায়, **বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর**, পৃ. ২১৬।

৭. সুলতান আহম্মদ **"এ নিউ লাইট অন দি জামি মসজিদ অব মহিসন্তোষ"** জে. পি. এইচ. এস. করাচী, ভল্যুম-৪৬, নং-২, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৮, পৃ. ৬১-৬৭।

হয়েছিল। উলুঘ ইকরার খানের নির্দেশে তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তা আশরাফ খান মসজিদটি নির্মাণ করেন। উল্লেখ্য, উলুঘ তুর্কী শব্দ এবং তা একজন সামরিক ও প্রশাসনিক উর্ধতন কর্মকর্তাকে বুঝায়। উলুঘ ইকরার খান সুলতান রুকন উদ্দীন বারবক শাহের শাসনামলে মহিসন্তোষসহ এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিভাজনের সেনাধ্যক্ষ ও ওয়াযির ছিলেন। বৃহত্তর রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে এই প্রশাসনিক ইউনিট গঠিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। আলোচ্য শিলালিপির সূত্রে বলা যায়, উলুঘ ইকরার খানের অধিনস্থ কর্মকর্তা ছিলেন আশরাফ খান এবং তাঁকে মহিসন্তোষের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই লিপিতে সুলতান রুকন উদ্দীন বারবক শাহকে একজন সুবিচারক শাসক বলা হয়েছে।

মহিসন্তোষ থেকে উদ্ধারকৃত শিলালিপিগুলো সাধারণত মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত তথ্য পেশ করে। এতে পাথরের উপর অতি মনোরম ও সূক্ষ্মভাবে বিভিন্ন আরবী লিখন-পদ্ধতিতে খোদাই কর্মে সে সময়ের শিল্পীদের যোগ্যতা আমাদের নিকট পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। উপরন্তু মুসলিম শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা এই শিল্পের উৎকর্ষ সাধনকে যথেষ্ট গতিময় করে রেখেছিল। এসব শিলালিপির বিষয়বস্তুর আলোচনা-পর্যালোচনা করে বলা যায়, মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে এগুলোর আবেদন মোটেও গৌণ নয়। এসব শিলালিপির বিষয়বস্তু থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলার মুসলিম শাসনামলের ইতিহাস পুনর্গঠন সম্ভব। আরো বলা যায়, মুসলিম সমাজ গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে মসজিদ একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান এবং তাঁর উপর গুরুত্ব আরোপ করে বাংলার সুলতানগণ স্থানে স্থানে মসজিদ নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন।

সাধারণত দেখা গেছে, মুসলিম শাসনামলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেই একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির সমষ্টি –Religious Complex গড়ে উঠেছে। এই প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, সরাই বা মুসফিরখানা এবং মাজার মাকবারা থাকতো। সাধারণভাবে ইবাদতের জন্যে মসজিদ, জ্ঞান-অর্জন ও পঠন-পাঠনের জন্যে মাদ্রাসা, ধর্মীয় প্রশিক্ষণ ও আধ্যাত্মিক সাধনার জন্যে খানকা, মুসাফিরদের থাকার জন্যে সরাই বা মুসফিরখানা এবং মৃত ব্যক্তির কবরের উপর মাকবারা নির্মাণ করা হতো। উল্লেখ্য, এসব ইমারত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন সময় শুধু মসজিদ ও মাদ্রাসা নিয়েই একটি Religious Complex গড়ে উঠত। মসজিদ প্রায় সময়েই মাদ্রাসারূপে ব্যবহৃত হতো। বিশষত মসজিদে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা চালু করার রেওয়াজ এখনো এদেশের বিভিন্ন স্থানে চালু আছে। আর মাদ্রাসা যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানেই মসজিদ অবশ্যই থাকতে হয়। এই মসজিদ হয় কোন আলাদা ভবনে অথবা মাদ্রাসা ভবনের একাংশেও হতে

পারে। পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, সাধারণত সৈয়দ, আলেম এবং সূফীরাই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতেন বেশী। কারণ আলেমগণ শিক্ষাদান কাজকে পারলৌকিক কর্তব্য বলে মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা তাকী উদ্দীন আল-আরাবীর মহিসুন মাদ্রাসা, মাওলানা শরফউদ্দীন আবু তাওয়ামার সোনারগাঁ মাদ্রাসা, মাওলানা হাওদা মিয়ার বাঘা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে।

বলা হয়ে থাকে, সূফীদের খানকা 'পৃথিবীতে শান্তির আধার' যেখানে সকলে 'নিজ নিজ অভীষ্ট লাভ করতে পারে।' সূফীরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলে সঙ্গে সঙ্গে খানকা তৈরী করার রেওয়াজও ছিল। কারণ তারা শরীয়ত শিক্ষা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারেফাতও শিক্ষা দিতেন। বিশিষ্ট আলেম সূফীদের মাজার একই Complex-এ থাকতো। মাওলানা তাকী উদ্দীন আল-আরাবী মহিসুনে শায়িত আছেন। মাওলানা শরফ উদ্দীন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁ- এ শায়িত আছেন/ মাওলানা হাওদা মিয়া এবং তাঁর পুত্র-পৌত্রাদির মাজার বাঘায় রয়েছে।[৯] মুসলিম শাসনামলে মুসাফিরদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুণ্যের কাজ বলে গণ্য হতো এখনো কালে-ভদ্রে তা শোনা যায়। তাই সরাই বা মুসাফিরখানা একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রূপে গণ্য হতো। সমগ্র মুসলিম আমলে এ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে শহরে সরাইখানা নির্মিত হতো। মুসলমান শাসকগণ এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুলতানী আমলে সরাই এবং মুঘল আমলে কাটরা বলা হতো। শেরশাহের সরাই প্রকল্প সুলতানী আমলে সারা ভারত উপমহাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ঢাকার বড় কাটরা, ছোট কাটরা মুঘল শাসকদের কীর্তি। শাহ সুজা, শায়েস্তা খান এবং মুর্শীদ কুলি খান এগুলো নির্মাণ করেন। শেরশাহের প্রত্যেক সরাই-এর সঙ্গে মসজিদের ব্যবস্থাও ছিল। ফলে শেরশাহের সরাইখানা প্রকল্প ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমষ্টি বা Religious Complex-এ পরিণত হয়েছিল।

মাওলানা তাকী উদ্দীন আল-আরাবীর মহিসুন মাদ্রাসার স্থান নির্দেশ এখন আর সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু মহিসুন (বারবকাবাদ শহর) থেকে চারটি মসজিদের শিলালিপি উদ্ধার হয়েছে। এখানে বাংলার দ্বিতীয় শাসক শীরান খলজীসহ সোহরাওয়ার্দী তরিকার অনেক সূফী-দরবেশ শায়িত আছেন।[৯] ফলে মহিসুন (মহিসন্তোষ) একটি Religious Complex বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমষ্টি ছিল।

---

৯. এই তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, পৃ.-৫০৮।

পঞ্চম অধ্যায়
বারবকাবাদ (মহিসন্তোষ) টাঁকশাল ও মুদ্রা

বাংলার মুসলমান শাসনামলের ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে মুদ্রার গুরুত্ব অপরিসীম। সমসাময়িক কালে লিখিত সূত্রে এমন তথ্য পাওয়া যায় না যা মুদ্রার সূত্রে উদ্ধার করা যায়। বিশেষ করে মধ্যযুগের মুসলমান শাসকদের ইতিহাস পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে মুদ্রা মুখ্য উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। উপরন্তু মুদ্রা লেনদেনের প্রয়োজন মিটানোর পর কার্যকরী প্রচার মাধ্যম হিসাবেও বিবেচিত হয়ে থাকে। কারণ নিজ নামে মুদ্রা প্রবর্তন একজন মুসলিম শাসকের বৈধ শাসনের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। মুদ্রায় এমন লিপি উৎকীর্ণ হয়ে থাকে যা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর আলোকপাত করে অথবা শাসক সম্পর্কে এমন বিশেষণ উপস্থাপিত হয় যার মূল্যায়ন করে ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত ধারা সংযোজন-বিয়োজন কিংবা পুনর্গঠন সম্ভব হয়। আমরা বাংলার মুসলমান শাসনামলের ইতিহাস সম্পর্কে মুদ্রার সাক্ষ্যে অনেক মূল্যবান তথ্য অবগত হতে পারি। প্রাসঙ্গিক কারণে বারবকাবাদ (মহিসন্তোষ) টাঁকশাল থেকে মুদ্রিত মুদ্রা এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হবে।

বাংলার দুশো বছর (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিঃ) স্বাধীন সুলতানী আমলের টাঁকশালের তালিকায় 'বারবকাবাদ' টাঁকশালের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই তালিকায় দেখা যায়, বাংলার দুশো বছর স্বাধীন সুলতানী আমলে হোসেনাবাদ (লখ্নৌতি), ফতেহাবাদ, নূসরতাবাদ, মুয়াজ্জমাবাদ, খলিফাতাবাদ, বারবকাবাদ (মহিসন্তোষ), মুহম্মদাবাদ, মাহমুদাবাদ এবং মুজাফ্ফরাবাদ এ টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত ছিল।[১] পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান রুকন উদ্দীন বারবকশাহ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিঃ) বারবকাবাদ টাঁকশাল প্রতিষ্ঠা করেন।[২] এবং এই টাঁকশাল থেকে মুদ্রা জারী করেন। রুকন উদ্দীন বারবকশাহ ব্যতীত সুলতান শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ (১৪৯০-১৪৯৩ খ্রিঃ) এবং হোসেন শাহী বংশের সুলতান নাসির উদ্দীন নূসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রিঃ) বারবকাবাদ টাঁকশাল থেকে তাঁদের মুদ্রা জারী করেন। বারবকাবাদ টাঁকশালের কিছু সংখ্যক মুদ্রা রাজশাহী বরেন্দ্র যাদুঘরে সংরক্ষিত হয়েছে (মুদ্রার আলোক চিত্র পৃষ্ঠা-৫৬ দ্রষ্টব্য)। কাজেই ধারণা করা সঙ্গত হবে যে, এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর

---

১. এম. আর. তরফদার, **হোসেন শাহী বেংগল**, পৃ. ১১৪।

২. আবদুল করিম, **করপাস অব দি মুসলিম কয়েন্স অব বেংগল**, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১৯৬০, পৃ. ১৬২; এ, কে, এম, ইয়াকুব আলী, **মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প**, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ-২৫৫।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বারবকাবাদ (মহিসন্তোষ) টাঁকশাল থেকে প্রয়োজনীয় মুদ্রা মুদ্রিত হয়েছে।

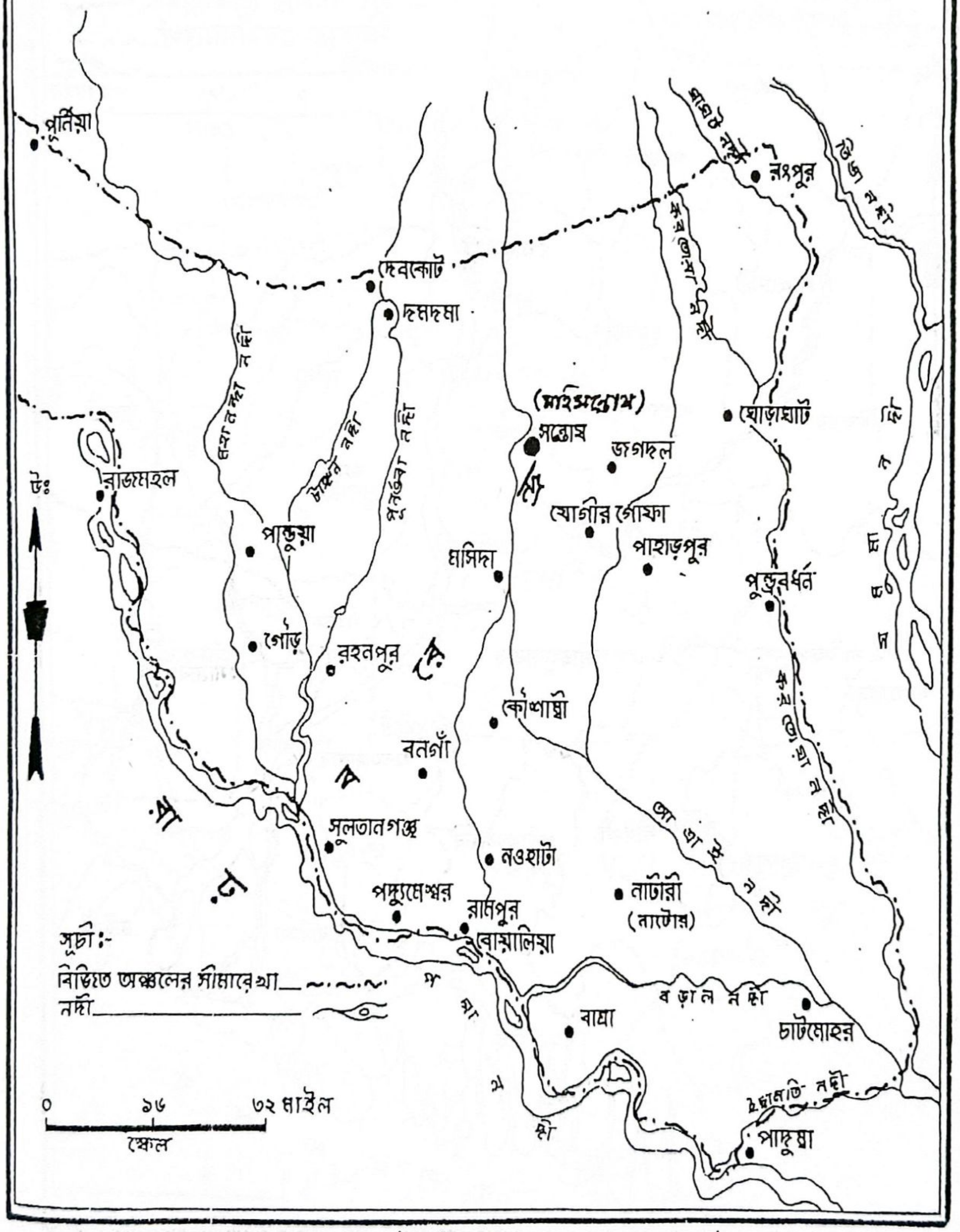
মুসলিম বাংলার মুদ্রা তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সুলতান গিয়াস উদ্দীন ইউওয়াজ খলজী (১২১২-১২২৭ খ্রিঃ) তাঁর মুদ্রায় কালিমা উৎকীর্ণ করে মুসলমানদের তাওহীদী বিশ্বাসকে জনগণের নিকট উপস্থাপন করেছেন।[৩] কিন্তু তাঁর পরবর্তী বাংলার সুলতানগণ তাঁদের মুদ্রায় কালিমা উৎকীর্ণ করা থেকে বিরত থাকেন। সুলতান রুকন উদ্দীন বারবক শাহ্ মুদ্রায় কালিমা উৎকীর্ণ করার রীতি পুনরায় চালু করেন।[৪] ফলে, বারবকাবাদ টাঁকশাল থেকে কালিমা উৎকীর্ণ করা প্রয়োজনীয় মুদ্রা মুদ্রিত হয়েছে। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এসব মুদ্রা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে বলে ধারণা করা যায়। সুলতান রুকন উদ্দীন বারবকশাহ স্বীয় পিতা সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহের অনুকরণে তাঁর মুদ্রায় "খলিফাতুল্লাহ্ বিল হুজ্জতি ওয়াল বুরহান" প্রমাণ ও দলীল সহকারে 'আল্লাহ্র খলিফা' লিপি উৎকীর্ণ করেন।[৫]

এই 'খলিফাতুল্লাহ্' লিপি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ইসলাম একটি অবিভাজ্য ঐশী জীবন বিধান। এই জীবন বিধানের বাস্তব প্রয়োগের অপর নাম শরীয়ত। ইসলামী শরীয়তের মাপকাঠীতে 'খিলাফত' একটি অবিভাজ্য আধ্যাত্মিক ও জাগতিক প্রতিষ্ঠান। খিলাফতের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালিত হবে। শরীয়তের সংজ্ঞায় মহানবী (সা) আল্লাহ্র খলিফা/প্রতিনিধি। খুলাফায়ে রাশেদীন এবং তাঁদের পরবর্তী উমাইয়া ও আব্বাসীর বংশের বৈধ খলিফাগণ রাসূল (সা)-এর খলিফা/প্রতিনিধি। উপরন্তু বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে স্বাধীন এবং অর্ধ স্বাধীন সুলতানগণ পরোক্ষভাবে মুসলিম জাহানের খলিফার খলিফা বা প্রতিনিধি। বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের পরেও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সুলতানগণ জনগণের আনুগত্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁদের মুদ্রায় 'খলিফা' অর্থজ্ঞাপক শব্দ উৎকীর্ণ করেছেন। বাংলার সুলতানগণও থেকে পশ্চাতে পড়ে থাকেন নি। সুলতান রুকন উদ্দীন বারবক শাহ এবং তাঁর ন্যায় অন্যান্য সুলতানদের "খলিফাতুল্লাহ্ বিল হুজ্জতি ওয়াল বুরহান" উপাধি গ্রহণ এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এসব সুলতানগণ নিজেদেরকে আল্লাহ্র খলিফা হিসাবে ঘোষণা করার পিছনে বাংলার ওলামা সম্প্রদায়ের সমর্থন ছিল বলে ধারণা করা যায়। কারণ আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের পরে মুসলিম বিশ্বে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসার জন্যে বিভিন্ন দেশের ওলামাগণ এগিয়ে আসেন এবং স্ব স্ব দেশে মুসলিম

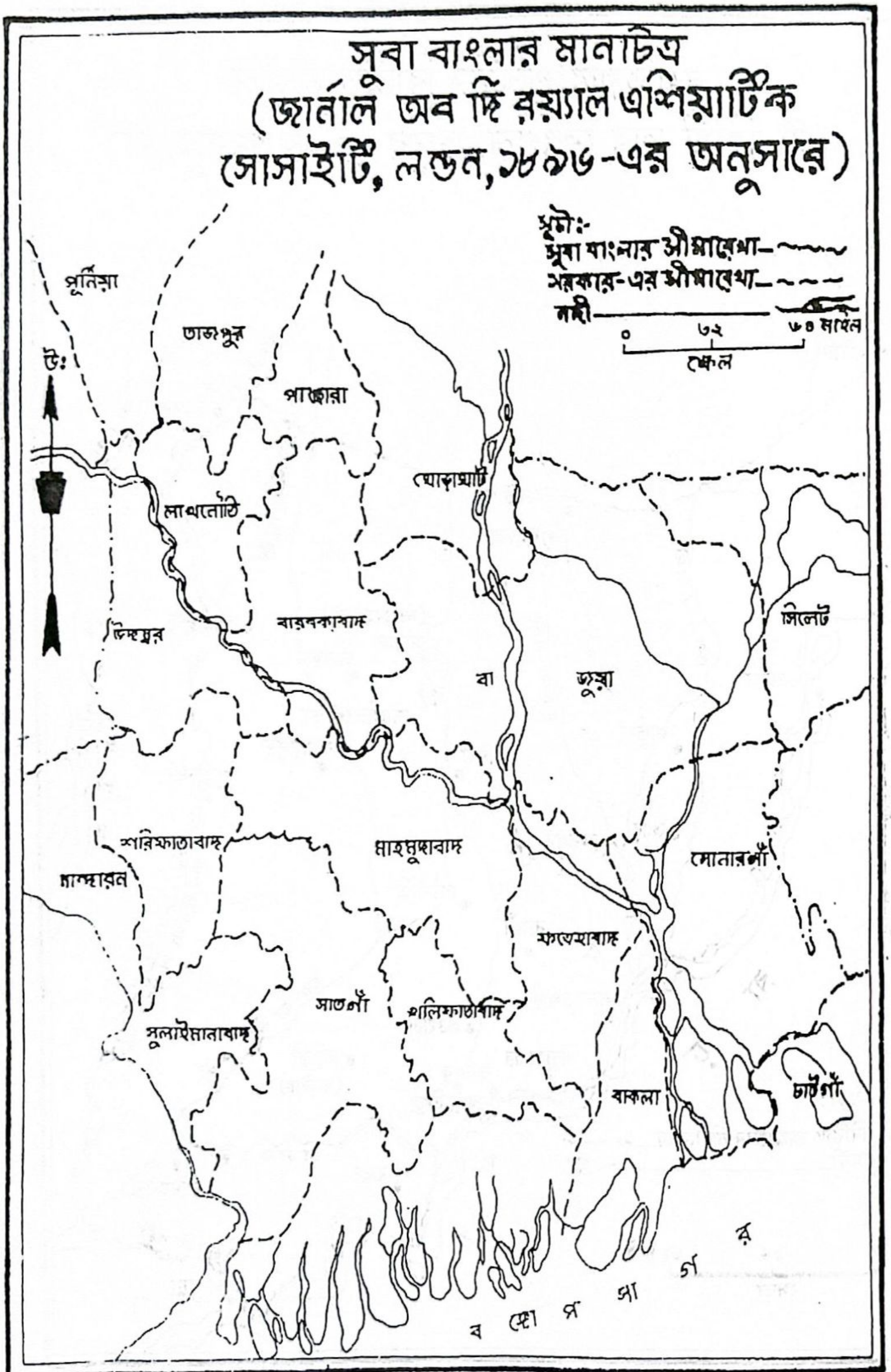
৩. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, **মুসলিম. মুদ্রা** পৃ.-২৩৮।
৪. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, **রাজশাহীতে ইসলাম**, পৃ-৮৮।
৫. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, **মুসলিম মুদ্রা**, পৃ.-২৪৬।

াসকগণকে খলিফার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আইনগত সমাধান দান করেন। ‍ৃপরন্তু তাঁরা শাসকদের 'খলিফাতুল্লাহ্' উপাধি গ্রহণও বৈধ বলে বিবেচনা করেন। াংলার ওলামা সম্প্রদায় এই ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের এই ‍ৃদ্যোগ নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ‍ুলতান রুকন উদ্দীন বারবক শাহ এবং তাঁর ন্যায় অন্যান্য সুলতানদের এই উপাধি ‍্রহণ মোটেও অযৌক্তিক ছিল না। টাঁকশাল শহর বারবকাবাদ তাই বাংলার মুসলিম ‍াসনের অতীত গৌরবগাঁথা দিনের কথা আমাদের স্মৃতিকে উজ্জীবিত করে তোলে। ‍ারবকাবাদ (মহিসন্তোষ) টাঁকশালের মুদ্রার পঠন-পাঠন বাংলার ইতিহাসের আরো ‍নেক অজানা তথ্য আমাদের সামনে উপস্থাপন করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

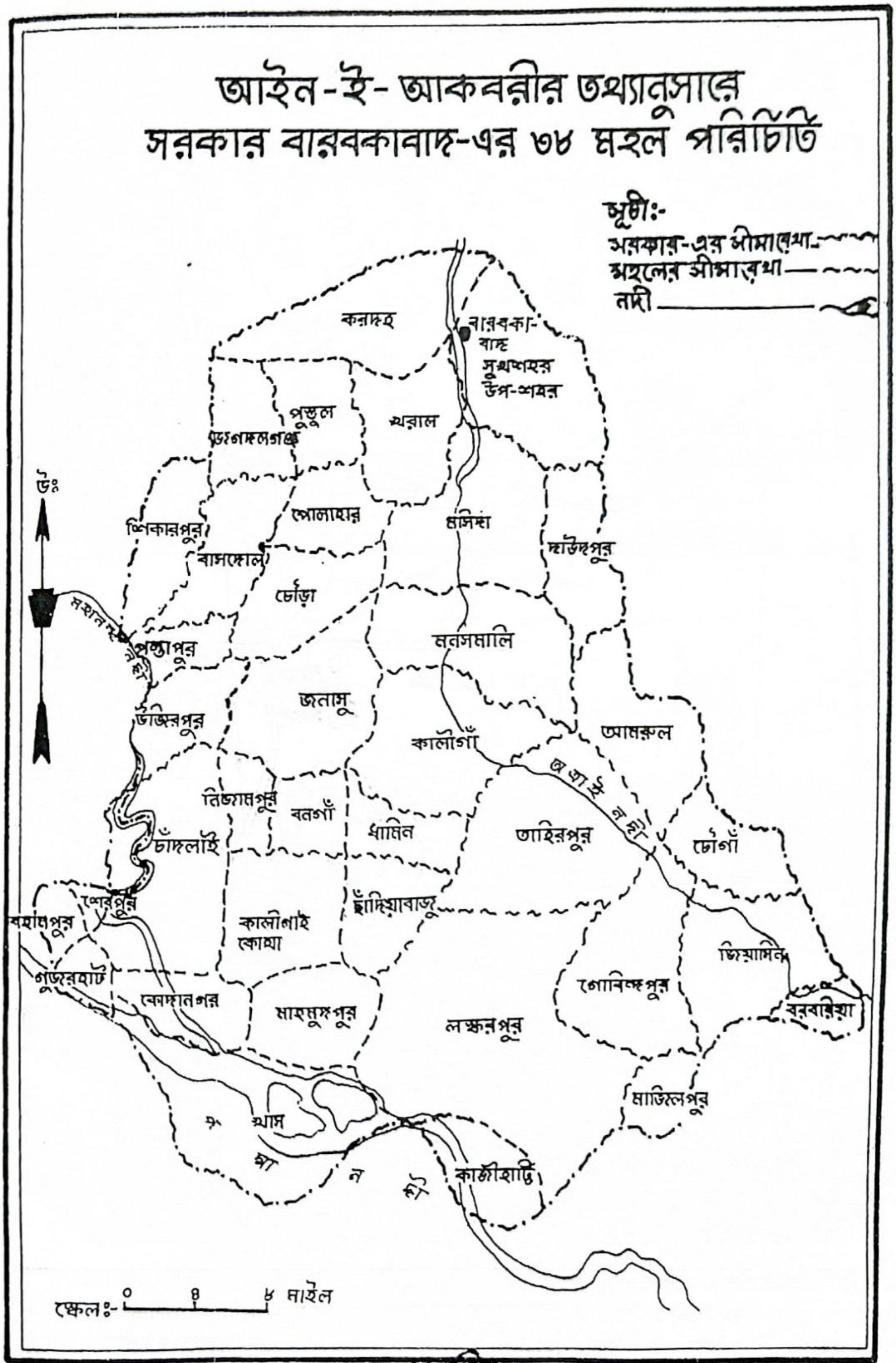
বখতিয়ার খলজীর বিজিত অঞ্চল
(দি হিস্ট্রি অব বেংগল, ভলুম-২ এর তথ্যানুসারে)



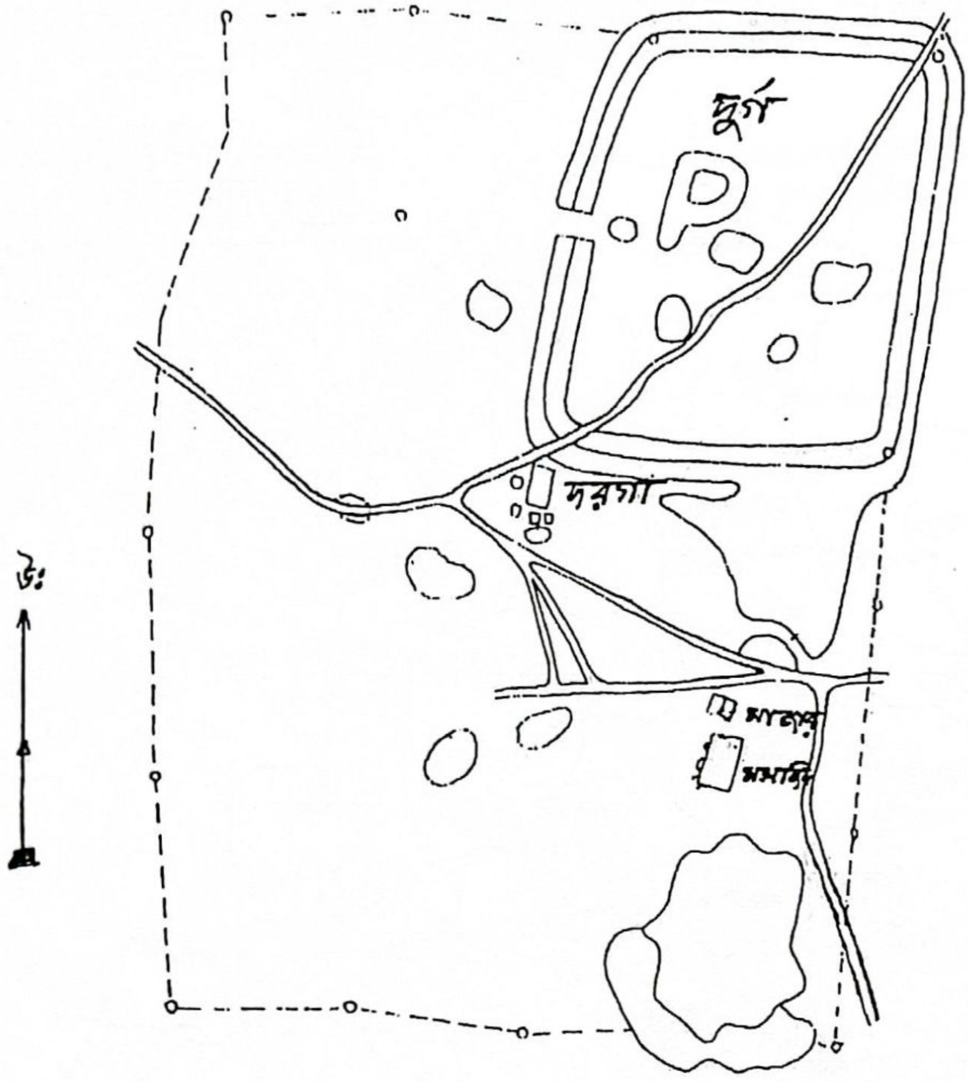
মানচিত্র-১


সুবা বাংলার মানচিত্র
(জার্নাল অব দি রয়্যাল এশিয়াটিক
সোসাইটি, লন্ডন, ১৮৯৬-এর অনুসারে)
সূচী:
সুবা বাংলার সীমারেখা—
সরকার-এর সীমারেখা—
নদী—
স্কেল
উঃ
পূর্নিয়া
তাজপুর
পাঞ্জোরা
ঘোড়াঘাট
লাখনৌতি
বারবকাবাদ
সিলেট
শরিফাতাবাদ
মাহমুদাবাদ
মান্দারন
সোনারগাঁ
ফাতেহাবাদ
সাতগাঁ
খলিফাতাবাদ
সুলাইমানাবাদ
বাকলা
চাটগাঁ
ব ঙ্গো প সা গ র

মানচিত্র-২

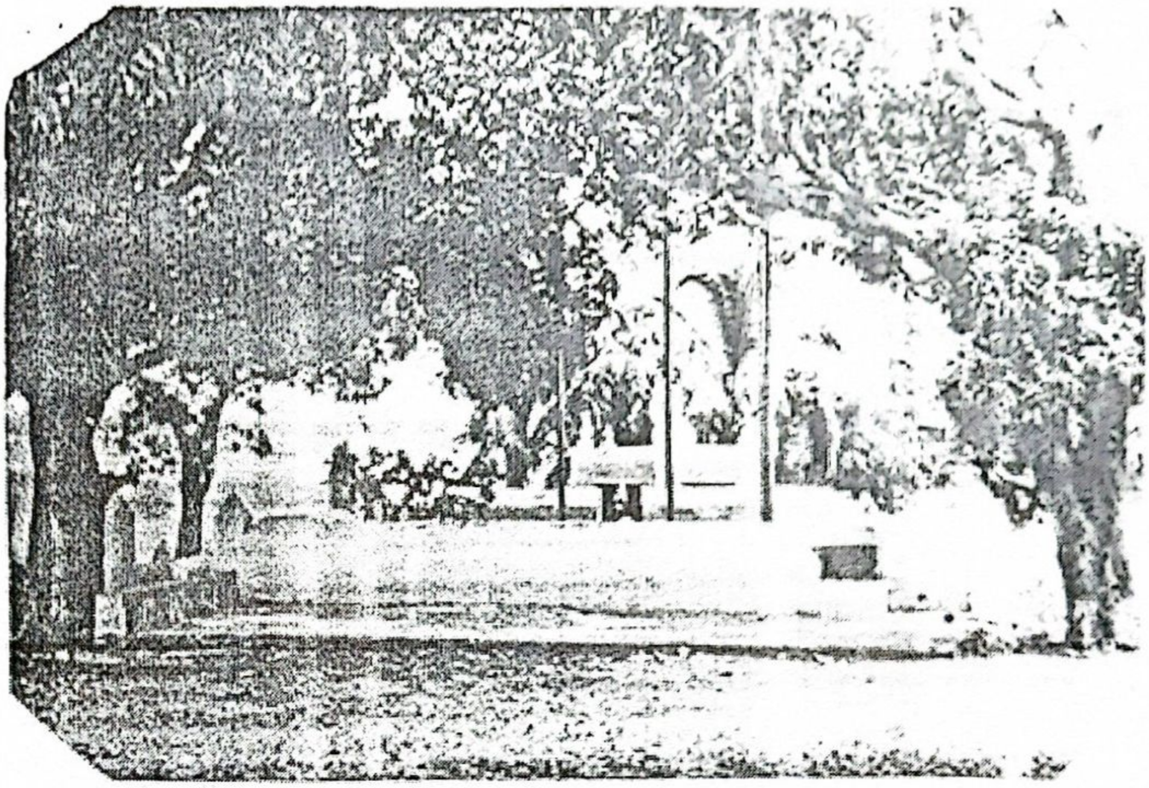

আইন-ই-আকবরীর তথ্যানুসারে
সরকার বারবকাবাদ-এর ৩৮ মহল পরিচিতি
সূচী:-
সরকার-এর সীমারেখা-
মহলের সীমারেখা
নদী
করন্দহ
বারবকাবাদ
সুখশহর
উপ-শহর
পুস্তুল
খরাল
শিকারপুর
পোলাহার
মসিন্দা
বাসন্ডোল
চোঁড়া
মনসমালি
পস্তাপুর
জনাসু
উজিরপুর
কালীগাঁ
আমরুল
বনগাঁ
ধামিন
তাহিরপুর
চাঁন্দলাই
চোঁগাঁ
শেরপুর
ছাদ্দিয়াবাজু
কালীনাই
কোয়া
গোবিন্দপুর
মাহমুদপুর
লস্করপুর
বরবারিয়া
মাডিজলপুর
কাজীহাট্টি
স্কেলঃ- ০ ৪ ৮ মাইল
উঃ

মানচিত্র-৩

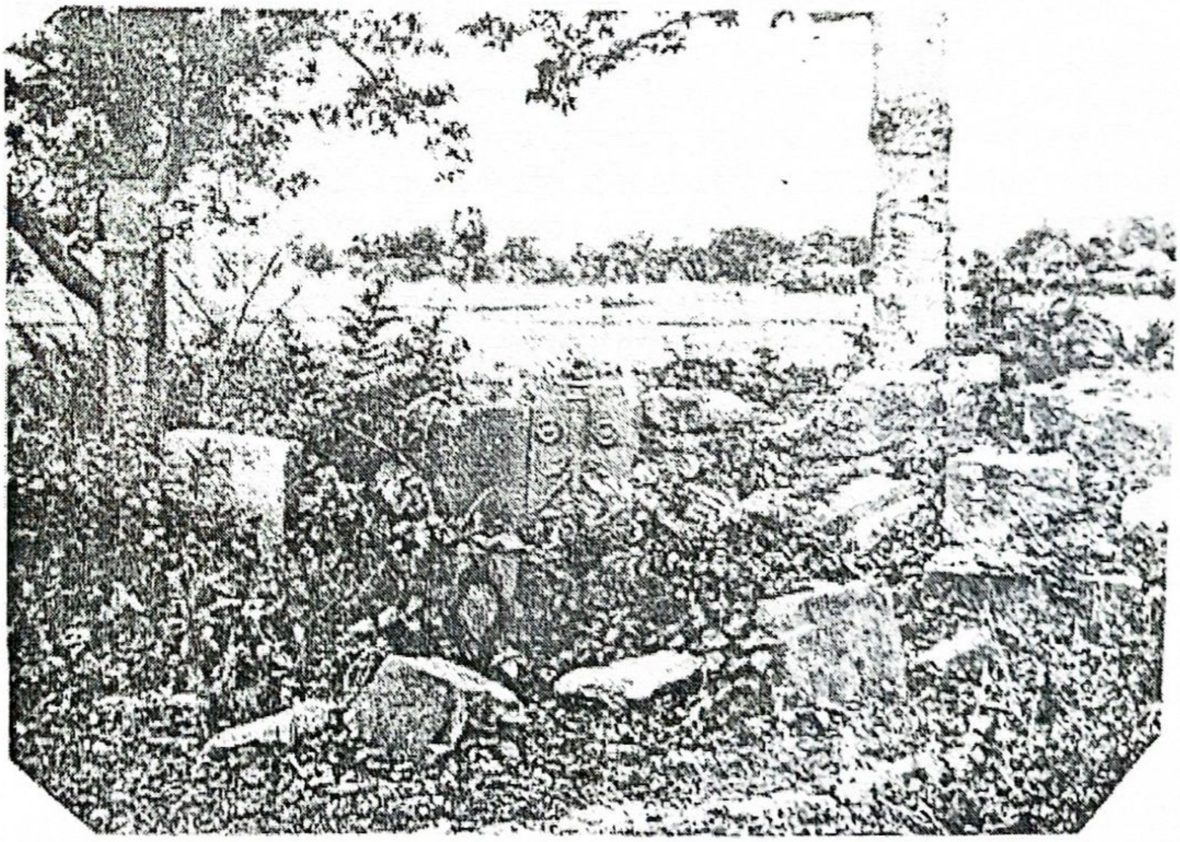


মানচিত্রে মহিসন্তোষ নগরী
স্কেল ছাড়া

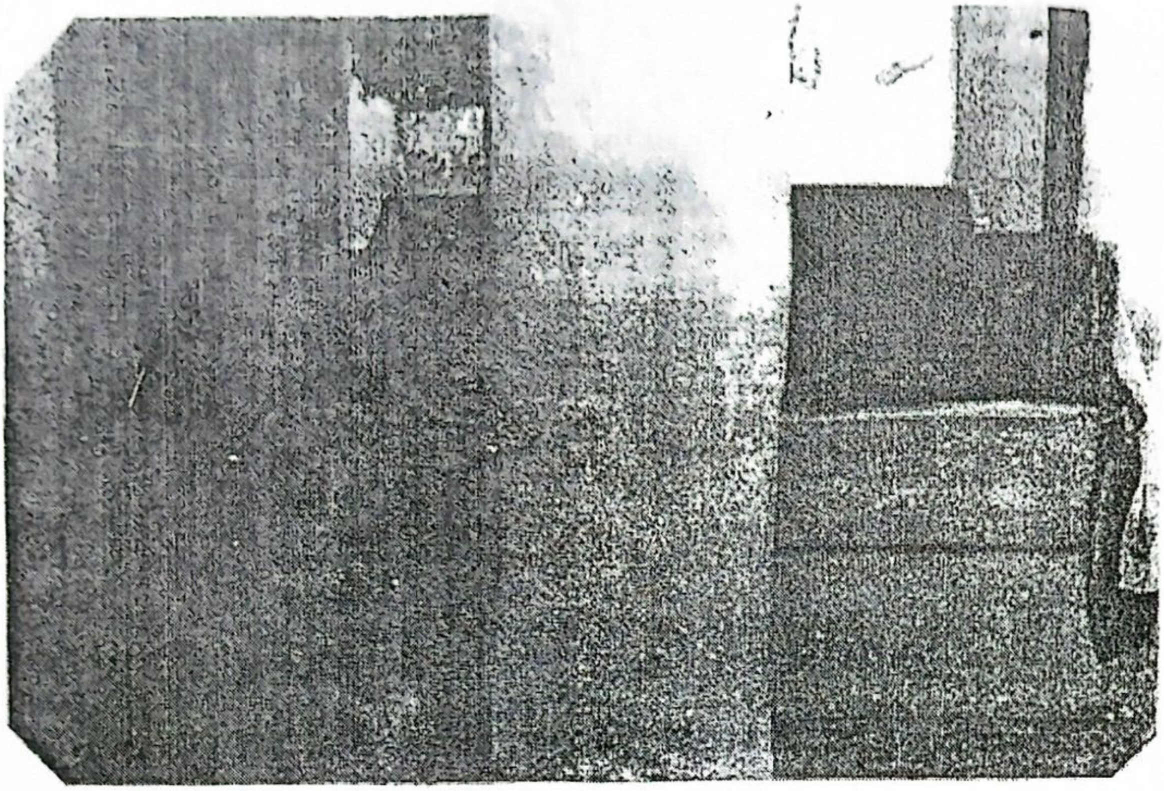
মানচিত্র- ৪



গ্রন্থের প্রচ্ছদ : মহিসন্তোষ দরগা



মহিসন্তোষ মসজিদের ধ্বংসপ্রাপ্ত মিহ্‌রাব ঃ সাইজ করা শিলাখণ্ড খোদাই করে বিশেষ সংযুক্তি প্রক্রিয়ায় মিহ্‌রাবের ভিতর অংশে সংস্থাপন করা হয়েছিল। মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালের টিকে থাকা অংশ থেকে দৃষ্ট হয় যে, এর ভিতর এবং বাহির উভয় অংশে সাইজ করা শিলাখণ্ড সংস্থাপন করে মসজিদটি অলংকরণ করা হয়েছিল। মিহ্‌রাবের ভিতর অংশে প্রস্ফুটিত গোলাপ এবং তার লতা-পাতা খোদাই করা হয়েছে। পরিপূর্ণ মিহ্‌রাবটি রাজশাহী বরেন্দ্র জাদুঘরে রক্ষিত হয়েছে।



মাওলানা তাকী উদ্দীন আল-আরাবীর মাযার ঃ স্থানীয়ভাবে এটি পীরের মাযার বলে পরিচিত। মাযারের অভ্যন্তরে দুটি কবর আছে। এর একটিতে মাওলানা তাকী উদ্দীন আল-আরাবী শায়িত আছেন। কিন্তু অন্য কবরটি কার তা নিশ্চিত করে জানা যায় না। জনশ্রুতি আছে যে, সেটি তাঁর মায়ের কবর।

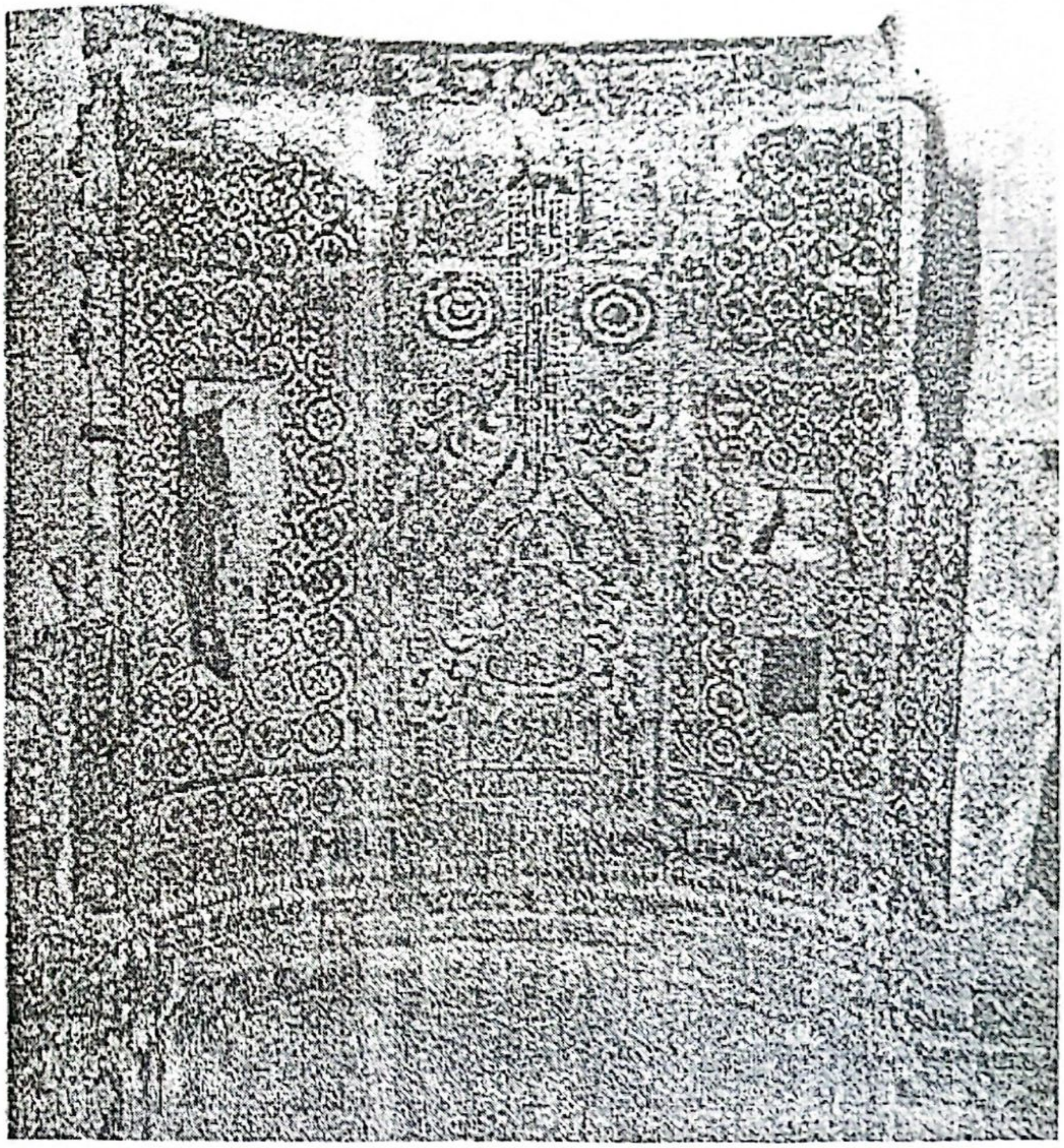
সমাধিসৌধ নির্মাণ ইসলামে প্রত্যক্ষভাবে স্বীকৃত নয়। মহানবী (সা) তাঁর কবর সম্পর্কে সাবধান হওয়ার কথা বার বার বলেছেন। কবর সাজানো এড়ানোর জন্যই হয়ত পীর সাহেব (তাকী উদ্দীন) তাঁর সমাধিসৌধ নির্মাণ না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে কবর সাজানোর জোয়ার উঠলে তার ঢেউ মহিসন্তোষেও লাগে। অনুমান করা হয় যে, পীর সাহেবের মৃত্যুর অনেক পরে স্থানীয় লোকজন অত্যন্ত সাদামাটাভাবে তাঁর সমাধিসৌধ নির্মাণ করে। প্রতি বছর চৈত্র মাসে এখানে পবিত্র ওরসের প্রচলন করেন।



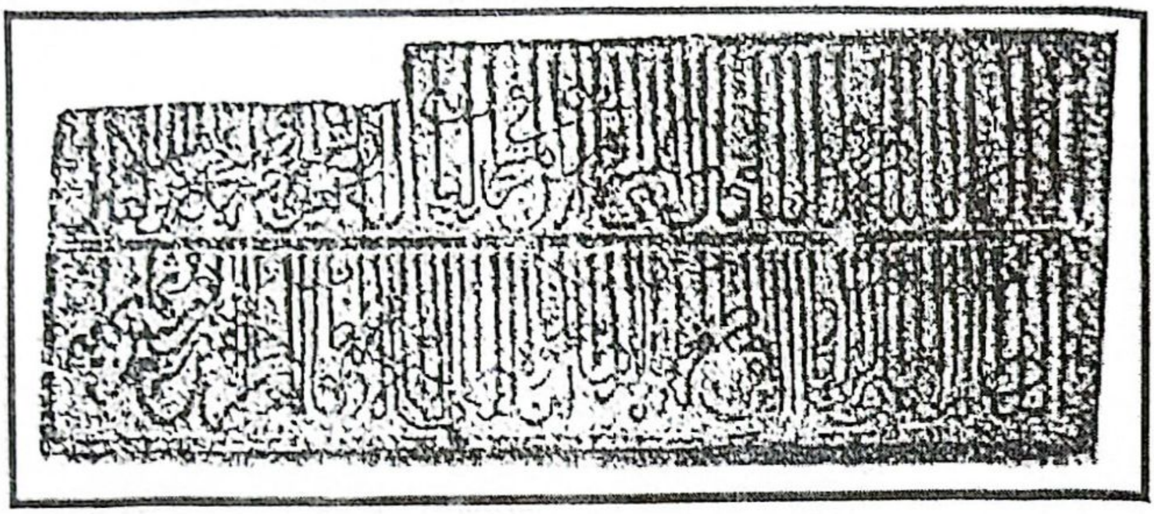
উজিরের মাযার ঃ (×) চিহ্নিত মসৃন সাদা পাথরের সমাধিটি স্থানীয়ভাবে উজিরের প্রশাসনিক কমকর্তার মাযার বলে পরিচিত। কিন্তু এটি কোন্ উজিরের বা কোন্ পাইক-এর তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশ্‌কিল ইতিহাসের সাক্ষ্য মতে এটি শহীদদের সমাধিস্থল। কারণ সুলতান রুকন উদ্দীন বারবক শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজীর সঙ্গে কামরূপ রাজ কামেশ্বরের এখানে (মহিসন্তোষ) যে যুদ্ধ হয় তাতে ইসমাইল গাজীর বিশ্বস্ত ১২০ জন যোদ্ধা শহীদ হন এবং সেই শহীদদের যুদ্ধ ক্ষেত্রেই সমাহিত করা হয়। এ স্থানটি বর্তমানে স্থানীয় জনসাধারণের কবরস্থান হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলার দ্বিতীয় শাসক ইযযুদ্দীন মুহম্মদ শীরান খলজী মহিসন্তোষেই শায়িত আছেন (তবকাত-ই-নাসিরী, পৃ. ৪৮)। আমাদের ধারণা, এটি তাঁরই কবরগাহ।



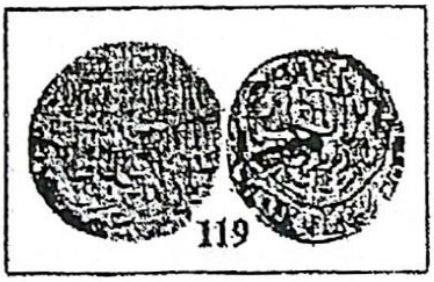
মহিসন্তোষ জামে মসজিদের ধ্বংসস্তূপ/মহিসন্তোষে ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ। বর্তমানে এইস্থানে পুরাতন ইটে কাদামাটির গাঁথুনি দিয়ে টিন সেডের একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে আশেপাশের মুসল্লিরা নামায আদায় করেন। এখানে একটি ফোরকানিয়া মাদ্রাসাও পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, উক্ত মসজিদের পশ্চিম প্রাচীরের মাত্র ৩ ফিট প্রাচীর ব্যতীত আর কোন দিকের প্রাচীর অবশিষ্ট নেই। ছবিতে যে প্রত্নজঞ্জাল দেখা যাচ্ছে, এখন গেলে সেগুলোও আর দেখা যাবে না। এগুলো স্থানান্তর হয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে চলে গেছে।



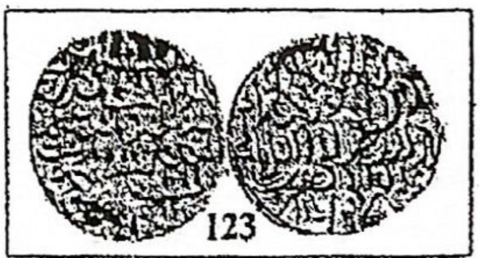
মহিসন্তোষ জামে মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহ্‌রাব ঃ অর্ধবৃত্তাকৃতির এই মিহ্‌রাবের উচ্চতা ১.৪০ মি., প্রস্থ ১.৩৫ মি. এবং গভীরতা ০.৮৪ মি.। মিহ্‌রাবের অভ্যন্তরভাগে অল্প খোদাইয়ে নকশা অংকিত এবং বিভিন্ন প্যানেলে বিভক্ত। এর মধ্যভাগে উল্লম্বভাবে খোদাইকৃত নকশাটি 'শিকল ও ঘন্টা' নকশার বিস্তৃত রূপ। 'শিকল ও ঘন্টা' নকশার উভয় পার্শ্বে একটি করে প্রস্ফুটিত পদ্ম ও ফুলের শাখা এবং ভূমি ভগ্ন 'পামেট' (Palmette) দ্বারা অলঙ্কৃত। মিহ্‌রাবে ব্যবহৃত প্রস্তর খণ্ড কালো পাথরের তৈরি (Black basalt)।



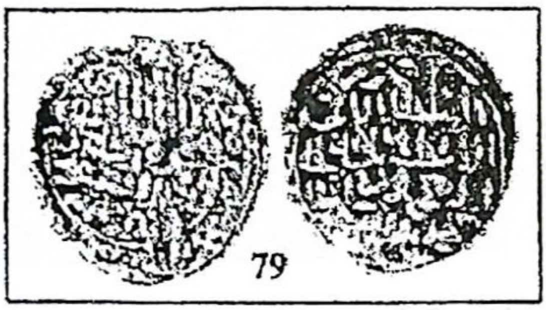
মহিসন্তোষ জামে মসজিদের শিলালিপি ঃ এটি বর্তমানে পাহাড়পুর (নওগাঁ) যাদুঘরে প্রদর্শনকক্ষে উন্মুক্ত রাখা আছে। কালো পাথরের উপর দুই সারিতে লিখা এই লিপিটির দৈর্ঘ্য ১১০ সে.মি. এবং প্রস্থ ৪২ সে.মি.। শিলালিপিটির উপরের দিকে বাম অংশ খানিকটা ভাঙ্গা। আরবি হরফে নাস্‌ক স্টাইলে খোদিত এই লিপি থেকে জানা যায়, ৮৬৭ হিজরী সনে (১৪৬৩ খ্রি.) সুলতান রুকন উদ্দিন বারবক শাহ উলুঘ খান হাসানের মাধ্যমে এই মসজিদ নির্মাণ করান।



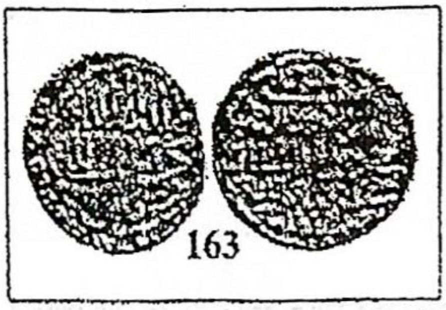
ক. বারবাক শাহের মুদ্রা (৮৬৪ হিজরি)



খ. বারবাক শাহের মুদ্রা (৮৬৪ হিজরি)



গ. বারবাক শাহের মুদ্রা (৮৭৩ হিজরি)



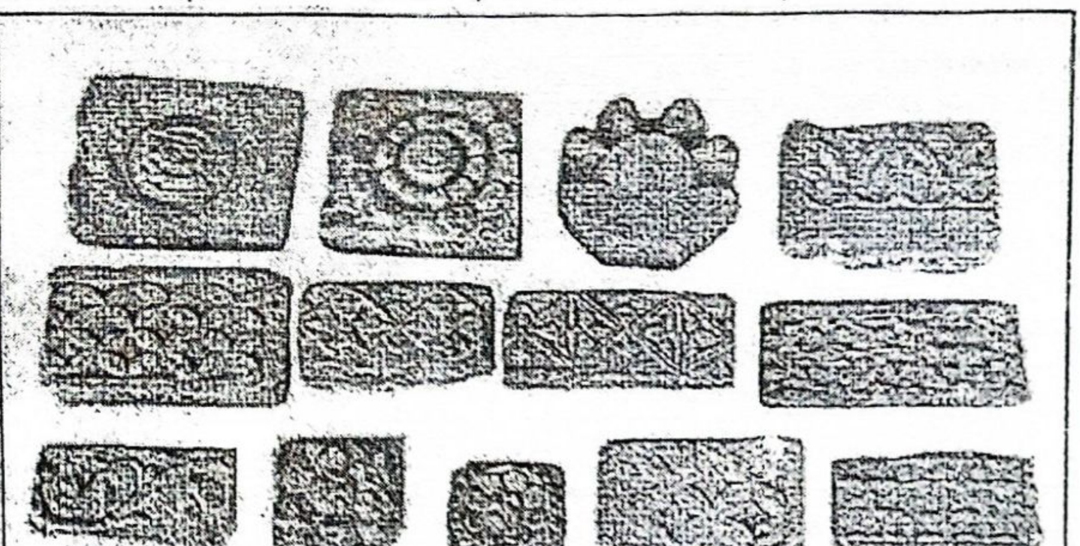
ঘ. মুজাফ্ফর শাহের মুদ্রা (৮৯৬ হিজরি)

বারবকাবাদ (মহসিন্তোষ) টাঁকশালে উৎকীর্ণ মুদ্রা ঃ গ্রন্থমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, সুলতান রুকন উদ্দীন বারবক শাহ তাঁর শাসনামলে (১৪৫৬-৭৬ খ্রি.) কোন এক সময়ে মহিসন্তোষে একটি টাকশাল (Mint Town) প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সুলতানের নামানুসারে 'বারবকাবাদ টাঁকশাল' নামেই পরিচিতি লাভ করে। বারবকাবাদ টাঁকশাল থেকে সুলতান রুকন উদ্দীন বারবক শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা ছাড়াও পরবর্তী পর্যায়ে সুলতান মুজাফ্ফর শাহ (১৪৯০-৯৩ খ্রি.) এবং সুলতান নাসির উদ্দীন নুসরত শাহের (১৫১৯-৩১ খ্রি.) নামাঙ্কিত মুদ্রা মুদ্রিত হয়েছে। বারবকাবাদ টাঁকশালে উৎকীর্ণ অন্য কোন সুলতানের মুদ্রা অদ্যাবধি আবিস্কৃত না হওয়ায় আপাতত ধারণা করা যায়, অন্তত ১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বারবকাবাদ টাঁকশাল টিকে ছিল।



গৌড় বিজয়ের স্মারক স্বর্ণমুদ্রা ঃ দ্রুতগামী অশ্বারোহী সেনাসহ নাগরী হরফে গৌড় বিজয় লেখা আরবী হরফে ৬০১ হি/রমজান ১৯; (১২ মে ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখ উল্লিখিত হয়েছে। আরবী হরফে দিল্লীর সুলতানের নাম সুলতানুল মুআজজম মুয়িয উদ্দুনীয়াওয়া দীন আবুল মুজাফ্ফর মুহম্মদ বিন সাম লেখা আছে। বখ্‌তইয়ার নিজের নামে কোন মুদ্রা প্রচলন করেননি।

দ্রষ্টব্যঃ- তিনটি মুদ্রা এ যাবৎ যথাক্রমে দিল্লী, লন্ডন ও ওয়াশিংটনের যাদুঘরে মিলেছে।



মহিসন্তোষে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ইট-ফলক ঃ মহিসন্তোষে এখন আর কোন ভবন টিকে নেই। তবে সেখানকার ধ্বংসস্তুপ থেকে কিছু পোড়ামাটির ইট আবিস্কৃত হয়েছে। এই সমস্ত ইট মহিসন্তোষের মসজিদ, মাদ্রাসা, মাযার এবং টাকশাল ভবনের দেয়ালে স্থাপিত ছিল বলে মনে করা হয়। এই সমস্ত ইট জ্যামিতিক নক্সায় নির্মিত হয়েছে। পদ্ম, শঙ্খলতা, আরশিলতা, ঘন্টা ও বেলমটিফ সংবলিত প্রাপ্ত পোড়ামাটির ইটগুলি ছোট সোনা মসজিদ ও দরসবাড়ি মসজিদের ড্রামের অভ্যন্তরভাগে যে সমস্ত অলঙ্কৃত ইট ব্যবহৃত হয়েছে, তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। মহিসন্তোষে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ইটগুলির নক্সা পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায়, এইগুলি আবহমান বাংলাদেশের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রস্তুত করা হয়েছিল।

পরিগ্রহণ নং	প্রত্ননিদর্শনের বিবরণ	উপাদান	পরিমাণ	ব্যাপ্তিকাল
৩৬৩২	শেরশাহের মুদ্রা	রৌপ্য	ব্যাস : ৩ সে. মি.	৯৪৯ হিজরি (১৫৪২ খ্রিস্টাব্দ)
৯৭.৭৮	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৬.৮×৯×৪ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৭৯	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৫×৯×৪.৮ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৮০	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১২.৫×৮×৩.৫ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৮১	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১১.৫×৬.৭×৫ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৮২	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১২.৫×৬.৭×৪ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৮৩	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৬.৪×৭.৩×৩ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৮৪	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৬.৫×৭.৫×৩ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৮৫	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৬.৪×৭.৫×৩ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৮৬	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৬.৫×৭.৫×৩ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৮৭	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৬.৫×৭.৫×২.৫ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৮৮	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৫.৫×৬×৩.৫ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৮৯	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৩.৪×৪.৭×৫.৭ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৯০	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১২.৩×৫.৮×৪ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৯১	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৭.৫×৮.৭×৪ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৯২	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১২×৬.৫×৩.৫ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৯৩	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	৮.৭×৭.৫×২.৫ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৯৪	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৪.৫×১৪.২×৪ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৯৫	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১২.৭×১১×৫.৩ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৯৬	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	৭×৫.৫×৩.৫ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৯৭	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	৭×৫.৮×৩.৩ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৯৮	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	৭.৫×৭.৪×৪.৫ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৯৯	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	৭.৫×৭.৫×৪ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.১০০	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৪.৫×১২.৫×৩ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.১০১	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৫.৮×১৪.৫×৪.২ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.১০২	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১২×১২×৪ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.১০৩	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৩.৪×১০.৬×৪ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.১০৪	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	৬.৫×৫.২×৫.১ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.১০৫	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	২০.৫×১৬.৫×৪.৫ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.১০৬	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	৯×৮.৫×৩ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.১০৭	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৩×১১×২ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.১৬	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৪×১০.৮ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.১৭	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৪.৫×৯.৫ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.১৮	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	৯.৫×৮ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.১৯	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১২×১১.৭ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.২০	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১০×৮.৫ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.২১	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১১.৫×৬.২ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.২২	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	৯×৪.১×১০.৫ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রক্ষিত মাহীসন্তোষের প্রত্ননিদর্শন (মুসলিম আমল)

পরিগ্রহণ নং	প্রত্ননিদর্শনের বিবরণ	উপাদান	পরিমাণ	ব্যাপ্তিকাল
২৯৮	নকশি পাথর, স্তম্ভশীর্ষ	বালুকা প্রস্তর	৪৯.৩×৪৯.৩×১২.৫ সে.মি	আ. ১০ম শতাব্দী
২৯৯ (ক)	মিহরাবের অংশ বিশেষ	কৃষ্ণ প্রস্তর	২৬×২৪.৭×১৬.৭ সে.মি	আ. ১৪শ শতাব্দী
২৯৯ (খ)	মিহরাবের অংশ বিশেষ	কৃষ্ণ প্রস্তর	২৬×২৪.৭×১৬.৭ সে.মি	আ. ১৪শ শতাব্দী
৩০০	মিহরাব (কিছু হিন্দু দেবতা ও স্থাপত্যের ভগ্নাংশ নিয়ে এই মিহরাব তৈরি করা হয়।)	কৃষ্ণ প্রস্তর	৯০×৩৮ সে.মি	আ. ১৪শ শতাব্দী
৩০১(ক-ছ)	মিহরাব (মিহরাবে ব্যবহৃত ভগ্নাংশগুলি ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ,ছ শিরোনামে সংরক্ষিত)	কৃষ্ণ প্রস্তর	উচ্চতা : ১৩৩ সে. মি. ব্যাসার্ধ : ২০৮ সে. মি.	আ. ১৪শ শতাব্দী
৩০২	নকশি পাথর (পাথরের স্লাবটি মূলত বিষ্ণুমূর্তির, তবে এর পশ্চাৎ ভাগে আরবীয় নকশায় অলকৃত লতাপাতা)	কৃষ্ণ প্রস্তর	৮৬.৩×৫৩.৪	আ. ১১শ শতাব্দী
৩০৩	৩বেড়া স্তম্ভ	বালুকা প্রস্তর	উচ্চতা : ৯৩.২ সে. মি.	আ. ১৪শ শতাব্দী
৩০৯	সদলের খণ্ডিতাংশ	বালুকা প্রস্তর	৫৬.৪×৩৩.৪×১৭.১ সে.মি	আ. ১১শ শতাব্দী
৩১১	নকশি খিলান	বালুকা প্রস্তর	২৬×২৪.৭×১৬.৭ সে.মি	আ. ১৪শ শতাব্দী
৩১২	প্রস্তব ফলক	বালুকা প্রস্তর	৫৭×৪১.৫×২০.৩ সে.মি	আ. ১৪শ শতাব্দী
৩১৩	কামান	লৌহ	উচ্চতা: ১৪৪.৮ সে.মি	আ. ১৪শ শতাব্দী
৩১৪	শিলালিপি: সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ (একটি বিষ্ণুমূর্তির খোদিত পাদদেশ মসজিদে ব্যবহৃত হয়। সম্ভবত এটি প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ থেকে সংগৃহীত।)	কৃষ্ণ প্রস্তর	৪৮.৩×২৪.১ সে.মি	৯২২ হিজরী (১৫০৭ খ্রিস্টাব্দ)
১১৫	প্রস্তব ফলক	বালুকা প্রস্তর	৪৭.৫×৫১×২৪ সে.মি	আ. ১১শ শতাব্দী
১২১	প্রস্তব ফলক	বালুকা প্রস্তর	৫৭.৫×৪১.৫×২০.৩ সে.মি	আ. ১৪শ শতাব্দী
১৪১	নকসি পাথর	বালুকা প্রস্তর	৫৩×৩২.২×১৮.৪ সে.মি	আ. ১৪শ শতাব্দী
৪৫৪	সর্দলের খণ্ডিতাংশ	বালুকা প্রস্তর	৪৯.৬×১৬.১×১৮ সে.মি	আ. ১১শ শতাব্দী
৪৫৫	সর্দলের খণ্ডিতাংশ	বালুকা প্রস্তর	৪৪.৯×১৭.৬×১৬.১ সে.মি	আ. ১১শ শতাব্দী
৪৫৬	স্তম্ভের ভগ্নাংশ	বালুকা প্রস্তর	৬৩.৫×৪৫.৫×৪৫.৫×১৮.৯ সে.মি	আ. ১৪শ শতাব্দী
৪৬৪	মিম্বার	বালুকা প্রস্তর	৪৩.২×৪৭×৩০.৮ সে.মি	আ. ১১শ শতাব্দী
৪৮৮	স্তম্ভশীর্ষের খণ্ডিতাংশ	বালুকা প্রস্তর	৬৮.৮×৩৮×৩১.৭ সে.মি	আ. ১০শ শতাব্দী
৬৪৬	নকশি পাথর	বালুকা প্রস্তর	৬৭×৫৪×২৪ সে.মি	আ. ১০শ শতাব্দী
৩৩৫৫	চক্রাকৃতি প্রস্তরফলক	বালুকা প্রস্তর	২৩.৯×১৯×১১ সে.মি	আ. ১৮শ শতাব্দী

পরিগ্রহণ নং	প্রত্মনিদর্শনের বিবরণ	উপাদান	পরিমাণ	ব্যাপ্তিকাল
২০০১.২৩	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১২.৫×৩×৮.৩ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.২৪	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৩.৭×৬.৭ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.২৫	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১০.১×৩.২×১১.৩ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.২৬	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৩.৯×১০.৫ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.২৭	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৩.১×১০.৫ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.২৮	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	৯×৩.৩×৬.৪ সে.মি	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী

সৌজন্যে ঃ বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর

পাহাড়পুর জাদুঘরে রক্ষিত মাহীসন্তোষের
প্রত্মনিদর্শন (মুসলিম আমল)

পরিগ্রহণ নং	প্রত্মনিদর্শনের বিবরণ	উপাদান	পরিমাণ	ব্যাপ্তিকাল
৯৭৮	নকশি পাথর	কৃষ্ণ প্রস্তর	৩৯×১৯ সে.মি	আ. ১২শ শতাব্দী
৯৯৫	শিলালিপি : সুলতান রুকনউদ্দীন বারবাক শাহ	কৃষ্ণ প্রস্তর	১১০×৪২ সে.মি	৮৬৭ হিজরি (১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দ)

সৌজন্যে ঃ পাহাড়পুর জাদুঘর

গ্রন্থপঞ্জি

ফার্সী গ্রন্থ (ইংরেজী ও বাংলায় অনূদিত)

১. আল্লামা, আবুল ফজল, **আইন-ই-আকবরী,** ভল্যুম-২ (এইচ. এস, জেরেট অনূদিত এবং জে. এন. সরকার কর্তৃক সংশোধিক ও টীকা টিপ্পনী সংযোজিত), ২য় সংস্করণ, কলকাতা, রয়াল এশিয়াটিক সোসইটি অব বেংগল, ১৯৪৯।

২. আকবর নামা, ভল্যুম-৩ (এইচ. বেভেরিজ অনূদিত), ২য় পুনর্মুদ্রণ, দিল্লী, এস. এস. পাবলিকেশনস, ১৯৭৭।

৩. মীনহাজ-ই-সিরাজ, **তবকাত-ই-নাসিরী** (আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকরিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

৪. বারনী, জিয়াউদ্দীন, **তারিখ-ই-ফিরোজশাহী** (গোলাম সামদানী কোরায়শী অনূদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

৫. আহমদ, খাজা নিযাম উদ্দীন, **তবকাত-ই-আকবরী,** খন্ড-১ (আহমদ ফজলুর রহমান অনূদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।

৬. সলিম, গোলাম হোসেন, **রিয়াজ-উস-সালাতিন** (আবদুস সালাম অনূদিত হিস্ট্রি অব বেংগল), পুনর্মুদ্রণ,. দিল্লী, ইদারাহ-ই-আদারিয়াত, ১৯৭৫।

৭. নাথান, মীর্জা, **বাহারীস্তান-ই-গায়বী,** খন্ড-১,২ (ড. বোরাহ কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত, গোহাটি, ১৯৩৬ এবং খালেকদাদ চৌধুরী কর্তৃক বাংলায় অনূদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।

ইংরেজী গ্রন্থবলী

১. আহমেদ, শামসুদ্দীন, **ইনসক্রিপশনস অব বেংগল,** ভল্যুম-৪, রাজশাহী, বরেন্দ্র মিউজিয়াম, ১৯৬০।

২. মজুমদার, আর সি (সম্পাঃ) **হিস্ট্রি অব বেংগল,** ভল্যুম-১, ঢাকা ইউনির্ভারসিটি, ১৯৪৩।

৩. সরকার, জে. এন. (সম্পাঃ) **হিস্ট্রি অব বেংগল,** ভল্যুম-২ (১২০০-১৭৫৭, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ১৯৭৬।

৪. আলী, এ. কে. এম. ইয়াকুব, **আসপেক্টস অব সোসাইটি এন্ড কালচার অব দি বরিন্দ** (১২০০-১৫৭৬ এডি), রাজশাহী, এস. সাজ্জাদুর রহিম, ১৯৯৮।

৫. দানী, এ. এইচ., **মুসলিম আর্কিটেকচার ইন বেংগল,** ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১৯৬১।

৬. আবদুল করিম, **সোসাল হিস্ট্রি অব দি মুসলিম ইন বেংগল** (ডাউন টু এডি. ১৫৩৮), ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১৯৫৯।

৭. **কর্পাস অব দি মুসলিম কয়েন্স অব বেংগল** (ডাউন টু এডি. ১৫৩৮), ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১৯৬০।
৮. **মুর্শিদকুলী খান এন্ড হিজ টাইমস,** ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১৯৬৩।
৯. হাসান, এস. এম. **গৌড় এন্ড হযরত পান্ডুয়া,** ঢাকা. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।
১০. তরফদার, এম. আর., **হোসেনশাহী বেংগল** (১৪৯৪-১৫৩৮), ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১৯৬৫।
১১. আবিদ আলী, খান সাহেব, **মেমোইরস অব গৌড় এন্ড পান্ডুয়া** (এইচ. এস. স্টেপলটন) কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত), কলকাতা বেংগল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো, ১৯৩১।
১২. আশরাফ, কে. এম. **লাইফ এন্ড কন্ডিশন অব দি পিউপল অব হিন্দুস্থান** (১২০০-১৫৫০), নিউ দিল্লী, এম. মনোহরলাল, ১৯৭০।
১৩. ফজলে রাব্বি, **ওরিজিন অব দি মুসলমানস অব বেংগল,** কলকাতা, ১৯৮৫।

বাংলা গ্রন্থবলী

১. **তিরমিযী আল-জামি।**
২. **মিশকাত আল-মাসাবীহ।**
৩. আলী, এ. কে. এম. ইয়াকুব, **মুসলিম মুদ্রা ও হস্ত লিখন শিল্প,** ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।
৪. **রাজশাহীতে ইসলাম,** ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২।
৫. আবদুল করিম, **বাংলার ইতিহাস ঃ সুলতানী আমল,** ঢাকা, বাংলা একাডেমী ১৯৭৭।
৬. চৌধুরী, হাসান আলী, **রংপুরের ইসলাম,** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪।
৭. নীহাররঞ্জন রায়, **বাঙ্গালীর ইতিহাস,** আদিপর্ব কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ১৯৮৮।
৮। করিম, মোঃ আবদুল (আমার), **বারবকাবাদ অঞ্চলের প্রশাসন ঃ একটি সমীক্ষা (১২০০-১৭৫৭),** অপ্রকাশিত এম. ফিল অভিসন্দর্ভ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯।
৯. **সুলতানী আমলে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ,** ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২।
১০। সুখময় মুখোপাধ্যায়, **বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল,** কলিকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১৯৯৬ (৫ম সংস্করণ)।

১১। মিছের, কাজী মোহাম্মদ, **রাজশাহীর ইতিহাস**, ১ম ও ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৫।
১২। আফজাল, খান মোহাম্মদ, **নওগাঁ মহকুমার ইতিহাস**, ১৯৭০।
১৩। রহিম, এম.এ, **বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস**, ১ম ও ২য় খণ্ড।
১৪. মেহ্‌রাব আলী, **দিনাজপুরে ইসলাম**, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯১৯।
১৫. যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ, **বাংলাদেশের প্রত্ন-সম্পদ**, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪।
১৬। করিম, মোঃ আব্দুল (আমার), **বাংলার প্রশাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস**, ঢাকা, সূচীপত্র, জানু-২০০৮।

ইংরেজী প্রবন্ধবলী

১. ব্লকম্যান, এইচ., "কন্ট্রিবিউশন টু দি জিওগ্রাফী এন্ড হিস্ট্রি অব বেংগল, " **জে. এ. এস. বি.**, পার্ট-২, ভল্যুম-৪২, কলকাতা, ১৮৭৩।
২. ডামান্ট, জি. এইচ., "নোটিস অন শাহ ইসমাইল গাজী উইথ এ স্কেচ অব দি কনটেন্টস অব এ পার্সীয়ান এম. এস. ইনটাইটেল্ড 'রিসালাত-উস-শুহাদা ফাউন্ড এ্যাট কাঁটাদুয়ার, রংপুর," **জে. এ. এস. বি.**, ভল্যুম-৪৩., কলকাতা, ১৮৭৪।
৩. বীমস, জন, **"নোটস অন আকবরস সুবাস উইথ রেফারেন্স টুদি আইন-ই-আকবর,"** জে. আর. এ. এস.নং-৪, লন্ডন, ১৯৯৬।
৪. মীর জাহান, **"মিন্ট টাউন্স অব মেডাইভ্যাল বেংগল,"** পি. পি. এইচ. সি. ৩য় বৈঠক, ঢাকা, ১৯৫৩।
৫. দানী, এ. এইচ., **"দি ডেট অব বখতিয়ারস রেড অন নদীয়া,"** আই.এইচ. কিউ ., নং-২, ভল্যুম-৩০, কলকাতা, ১৯৫৪।
৬. খান. এ. এম. **"সাকসেসরস অব ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খলজী,"** আই. সি. কলকাতা, ১৯৪৪।
৭. গুপ্ত, পরমেশ্বর লাল, **"দি ডেট অব বখতিয়ার খলজী'স অক্যুপেশন অব গৌড়,"** জে. ভি. আর. এম. ভল্যুম-৪, রাজশাহী, ১৯৭৫-৭৬।
৮. বাগচি, পি. সি. **"পলিটিক্যাল রিলেশন বিটুইন বেংগল এন্ড চীন ইন দি পাঠান পিরিয়ড," বিশ্ব ভারতী এন্যালস**, ভল্যুম-১, কলকাতা, ১৯৪৫।
৯. আবদুল করিম, **আসপেক্টস অব মুসলিম এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন বেংগল ডাউন টু** ১৫৩৮ এ. ডি.," জে. এ. এস. পি., ভল্যুম-৩, ঢাকা, ১৯৫৮।
১০. সুলতান আহম্মদ **"এ নিউ লাইট অন দি জামি মসজিদ অব মহিসন্তোষ,"** জে. পি. এইচ. সি. করাচী, ভল্যুম-৪৬, নং-২, ১৯৯৮।

বাংলা প্রবন্ধ

১. হোসেন, এ. বি. এম. মহিসন্তোষের মুসলিম নিদর্শন, "**ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা**, পৌষ-চৈত্র, ঢাকা, ১৩৭৬ সন।

শব্দ সংক্ষেপ

জে. এ. এস. বি. ঃ জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেংগল
জে. আর. এ. এস ঃ জার্নাল অব দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি (লন্ডন)
আই. এইচ. কিউ ঃ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিক্যাল কোয়ালিটি
আই.সি. ঃ ইন্ডিয়ান কালচার
জে. ভি. আর. এম. ঃ জার্নাল অব দি বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম
জে. এ. এস. পি.ঃ জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান
জে. পি. এইচ. এস. ঃ জার্নাল অব দি পাকিস্তান হিস্ট্রিক্যাল সোসাইটি
ই. ফা. বা. ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

ইফাবা গবেষনা/২০০৭-০৮/৫৬৯০/(উন্নয়ন)/৩২৫০

লেখক পরিচিতি

প্রফেসর মোঃ আব্দুল করিমের জন্ম ঃ ৩০ জুন ১৯৫১। জন্মস্থান নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলাধীন সিংগারুল গ্রাম। পিতা মরহুম আয়েন উদ্দীন, মাতা কাবেজান বিবি।

প্রফেসর করিম ১৯৬৭ সালে ধামইরহাট উপজেলাধীন ফার্সীপাড়া হাইস্কুল থেকে এস.এস.সি; ১৯৬৯ সালে জয়পুরহাট কলেজ থেকে এইচ. এস. সি; ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে বি.এ (অনার্স) ও এম.এ এবং ১৯৭৪ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল. বি পাস করেন। তিনি ১৯৯৯ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম.ফিল ডিগ্রী লাভ করেন। প্রথমে আইন ব্যবসা, এরপর ১৯৭৬ সালের ১৮ জানুয়ারী থেকে অধ্যাপনায় নিয়োজিত। সম্প্রতি তিনি রাজশাহী কলেজে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

প্রফেসর করিম অধ্যাপনার পাশাপাশি গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করে চলেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'বারবকাবাদ অঞ্চলের প্রশাসন ঃ একটি সমীক্ষা', এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, রাবি, ১৯৯৯; সুলতানী আমলে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২; "খাদ্য ও পুষ্টি", হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ১ম খণ্ডে প্রকাশিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪; বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থার ইতিহাস (মুসলিম আমল), ঢাকা, সূচীপত্র, ফেব্রুয়ারী ২০০৮ ; বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস (মুসলিম আমল), ঢাকা, সূচীপত্র, জুন ২০০৮ এবং নওগাঁ জেলার প্রত্ন-সম্পদ; বাংলাদেশে কৈর্বত শাসনের ইতিবৃত্ত (প্রকাশের জন্য প্রস্তুত) প্রভৃতি প্রধান। এছাড়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশ ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা, এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকাসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্র-পত্রিকায় তাঁর ত্রিশেরও অধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বাংলার মুসলিম শাসনামলের উপর (১২০৫-১৭৬৫ খ্রি.) একজন নিবেদিতপ্রাণ গবেষক। প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনায় তিনি ক্ষেত্র অনুসন্ধানকেই (Field study) বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আলোচ্য 'মহিসন্তোষ : সুলতানী আমলে হারিয়ে যাওয়া একটি নগরী' গ্রন্থটি তাঁর একটি আঞ্চলিক গবেষণা কর্ম।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

গবেষণা বিভাগ